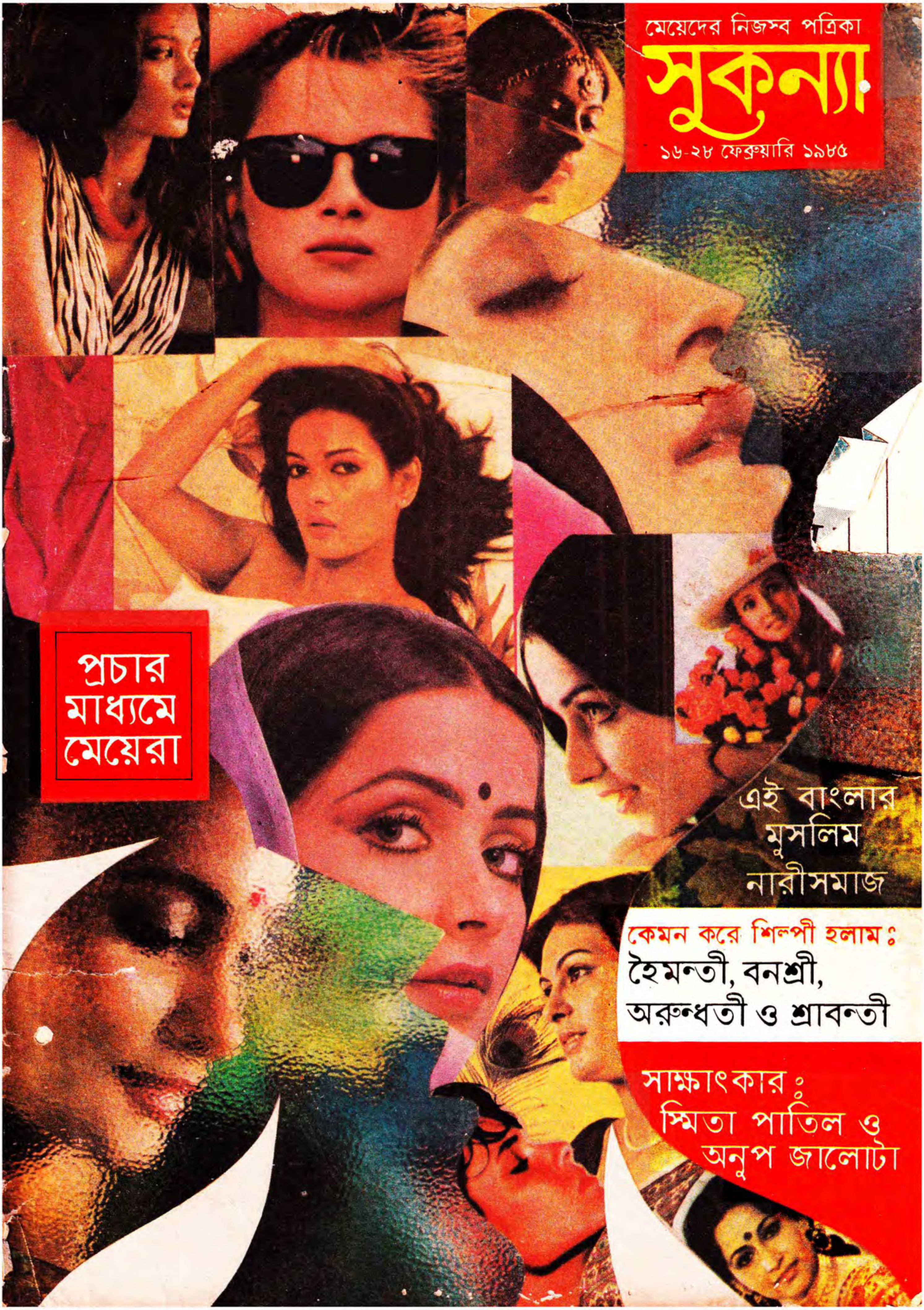

মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা
সুকন্যা
১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
প্রচার মাধ্যমে মেয়েরা
এই বাংলার মুসলিম নারীসমাজ
কেমন করে শিল্পী হলাম:
হৈমন্তী, বনশ্রী, অরুন্ধতী ও শ্রাবন্তী
সাক্ষাৎকার:
স্মিতা পাতিল ও অনুপ জালোটা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জী

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


আমাদের কোচ বলেছেন
দম বাড়াবার জন্য পুষ্টি দরকার।
দুধ, মল্টেড বার্লি-এইসব। তাই উনি
রোজ প্র্যাকটিসের আগে নিজের
হাতে আমাদের হরলিক্স খাওয়ান।
হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি
আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে
ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে,
পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে
পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের
নতুন রূপে
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HTD/HMM-8074 BEN

সুকন্যা

বর্ষ ১ সংখ্যা ১৭/১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫/৪-১৬ ফাল্গুন ১৩৯১

সম্পাদকীয়

সুকন্যার প্রতিটি সংখ্যা বের হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠক পাঠিকাদের অসংখ্য চিঠি আসে সেই সেই সংখ্যায় প্রকাশিত নানা রচনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। তা সেই রচনা সামাজিক সমস্যা নিয়ে হোক, হোক কারুর কৃতিত্বের কথা, হোক না চলচ্চিত্র বা নাটক সম্পর্কিত কোন নিবন্ধ। অকুণ্ঠে স্বীকার করছি, আপনাদের চিঠিপত্র আমাদের মুগ্ধ করছে, আমাদের উৎসাহিত করছে। আপনাদের কিছু চিঠি আমরা প্রকাশ করছি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও স্থানাভাবে সব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে আপনাদের ইচ্ছা আপনাদের চিন্তা যে আমাদের প্রভাবিত করছে, তার প্রমাণ সুকন্যার প্রতিটি সংখ্যার বিবর্তন বা পরিবর্তন।

অনেকেই অনুরোধ করেছেন, সুকন্যায় আরও বেশি ফিচার দেওয়া হোক এবং বন্ধ করে দিন ১০/১২ পৃষ্ঠার উপন্যাস। তাদের বক্তব্য : এই পরিসরে উপন্যাস যথার্থ রূপ নিতে পারে না। তার চাইতে বরং দুটি গল্প দিন। ১ মার্চ থেকে আমরা তাই দুটি গল্প এবং আরও বেশি ফিচার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা নজর দিচ্ছি যাতে ফিচারগুলি খুব আকর্ষণীয় হয়।

বিশ্ববন্দিত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। আমরা এই ছবি সম্পর্কে দু জনকে আলোচনার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। একজনের লেখা গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, আর একটি এই সংখ্যায় দেওয়া হল। 'ঘরে বাইরে' সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের বক্তব্য কি ?



সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা নিতাই ঘোষ

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২

মতামত

মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা নয় – সর্বসাধারণের পত্রিকা

মনোভাবটা ছিল এইরকম – শিরোভূষণে যখন 'মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা' লেখা থাকে, তখন ওটা মেয়েদেরই। অতএব পুরুষরা পড়বে কি? কিন্তু এখন বুঝছি কতবড় ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আমি বাস করছিলাম। আমি নেব না, স্টল মালিকও ছাড়বে না। কতকটা বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'সুকন্যা' পত্রিকাটির ১ ডিসেম্বর '৮৪ সংখ্যাটি নিতে হল। তারপরেই আমার বিস্ময়ের পালা – এ কি! এ যে সর্বসাধারণের পত্রিকা। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তথ্যের ছড়াছড়ি। ঘটমান রাজনীতি, সমাজনীতি, উপন্যাস, গল্প, খেলাধুলা, জ্যোতিষের প্রসঙ্গ – এ এক অপূর্ব সমন্বয়। এককথায় আজকের সমাজজীবনে যে বিষয়-গুলির প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না, সেই বিষয়গুলির উপর পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত। আমি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত।

ইন্দিরা গান্ধী – আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে নিয়ে অনেক পত্রিকা বেরিয়েছে। এ সংখ্যা ছাড়াও ইতিপূর্বে আপনারা আরও একটি ইন্দিরা সংখ্যা বের করেছিলেন। পাইনি বলে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু যা পেলাম সেটাই কম কি? আশাপূর্ণা দেবী থেকে হাসিনা ওয়াজেদ পর্যন্ত যে ক'জন খ্যাতনাম্নী বাঙালি মহিলা ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন – তাতে অনেক অজানা তথ্যই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নের দাম্পত্য জীবন – যা ছিল অজানা, 'সুকন্যা' থেকে তা ভালভাবে বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম। আমেরিকার তিন বাঙালি বধূর একজনকে কিন্তু আমরা চিনি, তিনি আলোলিকা দেবী। গৃহিণী হিসাবে জানতাম না, তিনি যে ভাল লিখতে পারেন সে পরিচয় কিন্তু আগেই পেয়েছি। সব কথা বলা সম্ভব নয়। আলাদা করে বললে পক্ষপাতিত্ব এসে যাবে। এককথায় বলতে পারি – সর্বাঙ্গসুন্দর, অপূর্ব।

প্রার্থনা করি – সুকন্যার চলার গতি যেন অব্যাহত থাকে।

বিশ্বাস করুন 'সুকন্যা', পড়ে যতখানি অভিভূত হয়েছি – অন্য কোনো পত্রিকা পড়ে তা হইনি। 'সুকন্যা' যেন চিরদিন সুকন্যা হয়েই থাকে – আর পাঁচটা পত্রিকার ভিড়ে যেন হারিয়ে না যায়।

শেখ মহম্মদ মহসীন
বুড়দা, রাঙাডি, পুরুলিয়া

মহিলা কয়েদী

গত ১-১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় মহিলা কয়েদীদের নিয়ে ডঃ নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ কমল মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ে অবাক হতে হয়।

জেলখানার ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু লেখাটি খুবই ছোট, মন ভরে না। অবশ্য সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, 'আইনের বেড়াজালের জন্য ইচ্ছা থাকলেও লেখকদ্বয় অনেক তথ্য ও ঘটনা জানা সত্ত্বেও লিখতে পারেননি।' আমার এবং আমার বন্ধুদের এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য কৌতূহল ও আগ্রহ থেকেই গেল।

আমাদের প্রিয় 'সুকন্যা'কে বাঁচিয়ে এবং আইন এড়িয়ে যাতে অনেক কিছু লেখা যায় এই পত্রিকায়, তার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল।

বকুল গোস্বামী
বৈঁচিগ্রাম, হুগলী

যাঁরা লেখা পাঠাবেন

- একালের মেয়েদের সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সরল ভাষায় লেখা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ 'সুকন্যা'-র জন্য সাদরে নেওয়া হবে। গল্প, হাসির গল্প, রম্যরচনাও পাঠাতে পারেন।
- সব রচনাই চলিত ভাষায় লিখতে হবে।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পাতায় বাঁদিকে উপযুক্ত মার্জিন রেখে কালিতে লিখবেন। লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রয়োজনীয় ফটো, গ্রাফ পাঠাতে পারেন।
- লেখার শেষে পুরো নাম ঠিকানা (বাংলা ও ইংরেজিতে) লিখতে ভুলবেন না। নাম ঠিকানাহীন কোনো রচনাই গ্রহণ করা হবে না।
- প্রয়োজনবোধে লেখা সংশোধন এবং আয়তন কমাবার অধিকার সম্পাদকীয় দফতরের থাকবে। এব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকলে তা স্পষ্ট করে জানাবেন।
- সব সময় কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। মনোনীত বা অমনোনীত কোনো রচনারই পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না।
- লেখা সম্পর্কে মতামত জানার জন্য জবাবি খাম, পোস্টকার্ড বা ডাকটিকিট পাঠানোর দরকার নেই। লেখা মনোনীত হলে তিন মাসের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়।

রান্না প্রতিযোগিতা

'সুকন্যা' রান্না প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দুটি মৌলিক রন্ধনপ্রণালী পাঠান। নির্বাচিত রন্ধনপ্রণালী লিখিয়েকে তাঁর রন্ধনপ্রণালী অনুসারে তৈরি খাবারের নমুনাসহ একটি নির্দিষ্ট দিনে 'সুকন্যা'র দফতরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী রন্ধন-পারিপাট্য এবং স্বাদের চমৎকারিত্ব অনুসারে ফলাফল ঘোষণা করবেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীরা যথাক্রমে ১২৫, ১০০ এবং ৭৫ টাকা পুরস্কার পাবেন। পুরস্কৃত রচনা 'সুকন্যা'য় প্রকাশিত হবে।

রচনা পাঠাবার সময় খামের ওপর 'রান্না প্রতিযোগিতা' কথাটি লিখবেন।

– সম্পাদিকা, 'সুকন্যা'

প্রতিবাদ

গত ১৬ জানুয়ারি '৮৫ সংখ্যায় 'মেয়েরা কেমন পাত্র চান' প্রতিবেদনে আমার সম্পর্কে লিখিত একটি উক্তির জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বিদ্যা চ্যাটার্জি চায় সংসারে তারা আলাদা থাকবে। বিশেষত শাশুড়ির উপদ্রব যেন না থাকে।'

ছোট পরিবার আমার পছন্দ – এমন অভিমত ব্যক্ত করলেও মাতৃস্থানীয়া কোনো মহিলা সম্পর্কে ওই ধরনের হীন উক্তি আমি করিনি প্রতিবেদনের লেখিকা ওই ধরনের উক্তি প্রকাশ করে আমাকে সমাজের চোখে হেয় করেছেন ও যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

আশা করি এই পত্রটি প্রকাশ করে আমার সঠিক মতবাদ জানাবার সুযোগ দেবেন।

বিদ্যা চ্যাটার্জি
গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ

লেখিকার বক্তব্য

শ্রীমতী বিদ্যা চ্যাটার্জির প্রতিবাদ পত্রটিতে আমি খুশিই হয়েছি। কারণ, সত্যই এ-ধরনের অভিমত তাঁর না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি বিদ্যা নিশ্চয়ই জানেন, প্রতিবেদিকা স্বয়ং তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেননি। আমার একার পক্ষে সবার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয় বলে পত্রিকা থেকে সহযোগী নিতে অনুমোদন করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সহযোগী বলেছেন যে, কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলায় তাঁর হয়ত লিখতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে।

তবু দায়িত্ব যখন আমার, তখন নিশ্চয়ই আমি দোষ স্বীকার করব এবং আশা করব আমার এই চিঠি থেকে তাঁর অপযশ দূর হবে।

বাসন্তী জোয়ারদার

'সুকন্যা'র প্রতি

প্রিয় সুকন্যা,

প্রথমেই তোমাকে জানাই ইংরেজী নববর্ষের (১৯৮৫) আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

তোমার আত্মপ্রকাশের শুভক্ষণেই এক অদম্য কৌতূহলে তোমার সঙ্গে পরিচিত হই।

তোমার মার্জিত ব্যবহার ও সৌন্দর্য আমাকে প্রথম দর্শনে মুগ্ধ করেছে। আমাকে কেন, আজ অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে তুমি মুগ্ধ করেছো। তাই তো, কখন যে সবকিছুকে (পত্রপত্রিকা) ছেড়ে একমাত্র তোমাকে কাছে টেনে নিয়েছি কিংবা তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হয়েছি জানি না। তবে এটুকু জানি, তোমার মধ্যে এক বিশেষ সম্ভাবনা ও গুণমুগ্ধকর আকর্ষণ শক্তি আছে, যার জন্য তুমি সকলেরই 'সুকন্যা'।

তুমি বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে ও দূরদর্শিতায় বহু প্রবীণকেও হার মানিয়েছো। তার প্রমাণ হলো, ইন্দিরাজীর সঙ্গে একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎকার।

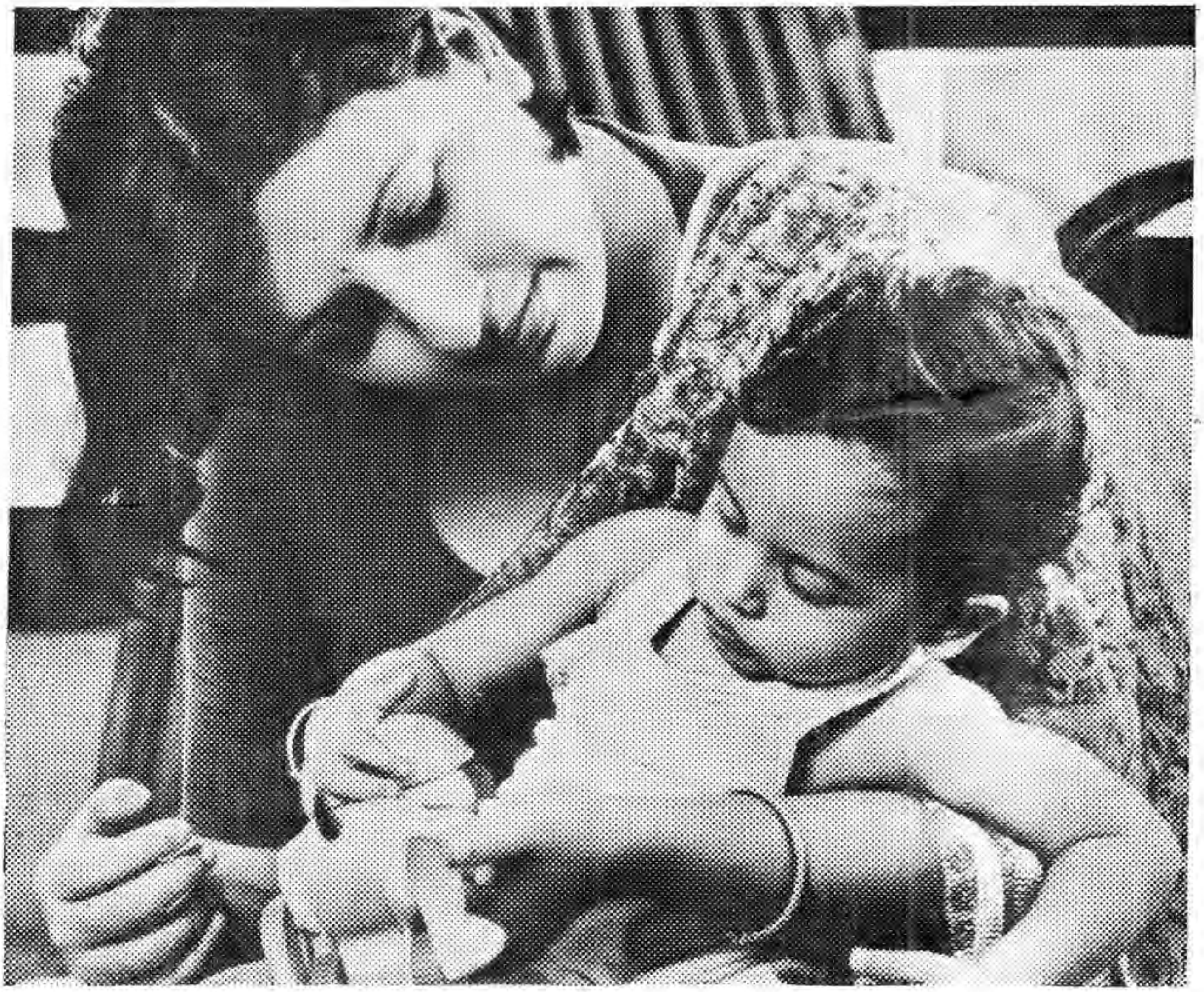
স্মরণ করা যেতে পারে প্রিয়দর্শিনী কন্যাকে (ইন্দিরাজীকে) তাঁর পিতা একবার লিখেছিলেন, 'ইতিহাস পড়া ভাল, আরও ভাল ইতিহাস সৃষ্টিতে সাহায্য করা।' প্রিয় ইন্দিরাজীর নিষ্ঠুর ও নির্মম হত্যাকাণ্ডে যে-ইতিহাসের সৃষ্টি, বাংলার বুকে একমাত্র তোমারই নেওয়া অমূল্য সাক্ষাৎকার যেন সেই ইতিহাস সৃষ্টিকেই সাহায্য করে বারবার।

তাই বলি, সার্থক হোক তোমার চেতনা, আর উন্নত হোক তোমার দৃষ্টি ও বিচারশক্তি। প্রিয় ইন্দিরাজীর জীবনের বহু কথাই আজ তাঁর অবর্তমানে আমাদের বারবার স্মরণ করায়। ছেলেবেলায় ইন্দিরাজীর প্রিয়তমা নারী ছিলেন 'জোয়ান অফ আর্ক'। এই জোয়ান অফ আর্কের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেরই ছবি এঁকেছিলেন অশ্বারোহিণীর ভূমিকায় একহাতে লাগাম ধরা, অন্যহাতে তলোয়ার – তাড়া করেছেন বৃটিশদের।

তোমার সর্বদাই উন্নতি কামনা করি। কোনরকম প্রলোভন যেন তোমায় আকৃষ্ট না করে। তাতে তোমার মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হবে, যা আমরা কখনই আশা করি না।

শোকস্তব্ধতা ও নির্বাচন হেতু চিঠি দিতে কিছুটা দেরি হওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ,

শোভা চক্রবর্তী
মানিকতলা হাউসিং এস্টেট
কলকাতা – ৫৪



পিয়ারলেসের মাধ্যমে আপনার সঞ্চয় মানেই তা সম্পূর্ণ নিরাপদ

কারণ আপনার কষ্টার্জিত টাকার ওপর পিয়ারলেস কোনো ঝুঁকি নেয় না।

আপনি পিয়ারলেসের মাধ্যমে যা সঞ্চয় করেন, সেই টাকার সবটাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ও অন্যান্য সরকারী সিকিউরিটিতে স্থায়ী আমানতরূপে সরকারের কাছেই বিনিয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিয়ে একমাত্র সার্টিফিকেট-হোল্ডারদের ফেরত দিতেই ওই টাকা তোলা যায়, অন্য কোনো কারণেই নয়। সঞ্চিত টাকার এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্যই পিয়ারলেস আর সব নন-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় একেবারে আলাদা। কারণ এই ধরনের আর কোনো কোম্পানীই সঞ্চয়কারীদের টাকার ওপর একেবারে শতকরা একশ ভাগ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

পিয়ারলেসের এই অভাবনীয় সাফল্যের গোপন শক্তি কোথায়? বলা বাহুল্য, ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত পিয়ারলেসের অনন্য সমাজ কল্যাণ প্রকল্পই এই সাফল্যের চাবিকাঠি। বিজ্ঞানসম্মত ও এ্যাকচুরিয়াল পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুত এই সঞ্চয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, স্বল্প-আয়ের মানুষদের সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। এই কাজে নিবেদিত কর্মীদের সুগঠিত টীম সারা দেশে, এমন কি সুদূর গ্রামে গ্রামান্তরে, অজ পাড়াগাঁয়েও তাদের কাজ সংগঠিত করছেন—আর তাই বছরের পর বছর এই প্রকল্প জনসাধারণের কাছে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আজ প্রতি ৫০ জন ভারতীয়ের একজন পিয়ারলেস সার্টিফিকেট-হোলডার—যা ভারতের বৃহত্তম নন ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের ওপর জনসাধারণের পূর্ণ আস্থার প্রমাণ।

সরকারী হেফাজতে মোট বিনিয়োগ ৫০০ কোটি টাকারও বেশি।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

পিয়ারলেস ভবন,
৩ এস্প্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

ভারতের বৃহত্তম নন-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

PGI-5724



Rumple Minze. Icy cool. Authentically German.

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও মেয়েদের ইমেজ

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পকথাতেই শুরু করা যাক। হলিউডের এক মহিলা ফ্রান্সেস ম্যারিয়ান প্রযোজক উইলিয়াম ফক্সের কাছে চিঠি পাঠালেন চিত্রনাট্যকারের পদপ্রার্থিনী হয়ে।এটা তিরিশ দশকের কথা । যা মাইনে তিনি চাইলেন তা তখনকার দিনের তুলনায় খুবই মোটা । চিঠি পড়ে অবাক হলেন ফক্স সাহেব, ডেকে পাঠালেন তাঁকে । ম্যারিয়ান ঘরে ঢুকতেই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— "এত সুন্দরী আপনি, চিত্রনাট্য লিখে কি করবেন ? তার চাইতে অভিনয় করুন না ।" তারপর তিনি বোঝালেন অভিনেত্রীদের সুযোগ সুবিধা, গাড়িবাড়ি, গয়নাগাটি কত কী । আর তারপরেও আছে তাদের গ্ল্যামার, সব সময়ে লাইম লাইটে থেকে বহু পুরুষের তোষামোদ ও খোশামোদের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিতে পারেন, আর এদিকে তখন বেচারি লেখিকা পানসে চোখে, সিড়িঙ্গে চেহারায়, পেছনের খুপরিতে বসে খটাখট টাইপ রাইটার বজিয়ে চলেছেন ।

মোটামুটি এইভাবেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমাদের মেয়েদের ইমেজ তৈরি হয়েছে । ভার্জিনিয়া উলফ্ লিখেছেন— "উইমেন হ্যাভ সার্ভড অল দিজ সেঞ্চুরিস অ্যাজ লুকিং গ্লাসেস পোজেসিং দ্য ম্যাজিক ডেলিসাস পাওয়ার অব রিফ্লেকটিং দ্য কিলার অব ম্যান অ্যাট টোয়াইস ইট্স ন্যাচারাল সাইজ ।" আসলে মেয়েদের এই চেহারা সর্ম্পকে ধারণা এসেছে, মেয়েরা যে 'উইকারসেক্স' এই বিভ্রান্তি থেকে । আমাদের দেশে এই ধারণা আরও প্রকট । যে কোন গণমাধ্যমেই মেয়েদের ব্যবহার করা হোক না কেন, সেখানে তাদের শরীর ও সৌন্দর্যকেই একমাত্র মূলধন করা হয় । তাদের সৃষ্টিশীলতা কিংবা কর্মক্ষমতাকে যথাসম্ভব গৌণ করে রাখা হয় ।

কিন্তু এটা যে কতবড় ভুল সেটা একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়বে । আজকের যুগে মেয়েদের একাধারে শুধু যে গৃহপরিচালনা ও সন্তানপালনের দায়িত্ব নিতে হয় তাই নয়, বহুক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে অন্নসংস্থানও করতে হয় । আসলে মেয়েরা যে দুর্বল এই তত্ত্ব কোথা থেকে প্রমাণিত হয় ? সমীক্ষায় দেখা গেছে, মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বেশিদিন বাঁচে । সন্তানধারণ ও প্রসব যন্ত্রণার এতখানি কষ্টের মোকাবিলা যদি তারা এত সাহসের সঙ্গে করতে পারে, তবে তাদের দুর্বলতাটা কোথায় ? শিক্ষাদীক্ষাতেও তারা পুরুষের চাইতে কোনো অংশেই কমতি নয় । অথচ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কিংবা গণমাধ্যমে মেয়েদের ভূমিকা সবসময়েই কিছুটা খাটো করে দেখানো হয় ।

প্রথমে খবরের কাগজের কথাই ধরা যাক, আমার যতদূর ধারণা ভারতবর্ষের কোনো দৈনিক

> *যে কোন গণমাধ্যমেই মেয়েদের ব্যবহার করা হোক না কেন, সেখানে তাদের শরীর ও সৌন্দর্যকেই একমাত্র মূলধন করা হয় । তাদের সৃষ্টিশীলতা কিংবা কর্মক্ষমতাকে যথাসম্ভব গৌণ করে রাখা হয়*

কাগজে সম্পাদনার দায়িত্বে কোনো মহিলা নেই । দিল্লি, বম্বে এবং এখন কলকাতায়ও কিছু সংবাদপত্রে কয়েকজন মহিলা সাংবাদিক হয়তো আছেন, তবে তাঁরা কখনোই পুরুষ সাংবাদিকের মতো গুরুদায়িত্বে থাকেন না । বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় একমাত্র ফ্যাশন, রূপচর্চা, সন্তানপালন, রান্নার বিভিন্ন রেসিপি ও সেলাই সম্বন্ধে লেখা ছাড়া মেয়েদের অবদান কতটুকু ? কয়েক বছর আগে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, খবরের কাগজে সংবাদ বিভাগে মহিলাকর্মীদের সংখ্যা এত কম কেন ? হিন্দি কাগজের সম্পাদক উত্তর দিয়েছিলেন যে, খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক বেশিরভাগই পুরুষ এবং মেয়েরা সাধারণত খবরের কাগজ পড়েন শুধু রবিবার এবং ছুটির দিনে, তাও বেশির ভাগ হালকা লেখা ও সিনেমা সংক্রান্ত সংবাদের জন্য । এইজন্য সংবাদ উপস্থাপনাতেও পুরুষ প্রাধান্যই বেশি মহিলা সাংবাদিক সম্পর্কে তিনি বলেন, অন্তত তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি বিশ্বাস করেন যে, মেয়েরা ভাল সাংবাদিক হতে পারেন কিন্তু খবরের কাগজের সময় বাঁধাধরা না হওয়ায় মেয়েদের অসুবিধা হয় । আরেকজন বিখ্যাত সম্পাদকের মতে, খবরের কাগজের পাঠিকারা যদি রাজনীতি ও সমাজনীতি সংক্রান্ত খবরে আরও বেশি উৎসাহী হন তাহলে বোধ হয় কাগজে মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে ।এগুলো সবই অবশ্য উদ্ভট যুক্তি বলে আমার মনে হয় । নার্সিং অথবা ডাক্তারি করবার জন্য নাইট শিফটটি দিতে গিয়ে যদি মেয়েদের পারিবারিক জীবন 'মিত্র' ও 'শান্তিপূর্ণ' থাকে তবে নিউজ ডেস্কে অসুবিধে কোথায় ?

এবারে আসা যাক বিজ্ঞাপনের জগতে । এ এক রঙচঙে ঝলমলে জগৎ, বাস্তবতার মধ্যে থেকেও বাস্তব পরিবেশের বাইরে নিয়ে যায় মনকে ।'কনজিউমার প্রোডাক্টস-এর যে সব বিজ্ঞাপন, সেখানে বেশির ভাগ সময়েই নারী শরীরকে ব্যবহার করা হয় রঙবাহারি উপকরণ হিসেবে । বিজ্ঞাপনের কর্তারা অবশ্য বলেন যে, পাবলিক যা চায় তাই তাঁরা দেন, কিন্তু পাবলিক কি সব সময় উন্মুক্ত নারী শরীর চায় ? দেখা গেছে গয়নাগাটির বিজ্ঞাপনেও নারী শরীরের বেশ কিছু অংশ আবরণহীন করে দেখানো হয় । কেন, মেয়েরা যখন গয়না পরে রাস্তায় বেরোয় তখন তাদের শরীর কি বে-আবরু থাকে ? গয়না যখন মেয়েরাই পরে তখন বিজ্ঞাপনও নিশ্চয়ই তাদেরই আকর্ষণ করার জন্য । তাই মেয়েদের খোলামেলা শরীর দেখিয়ে মেয়েদেরই আকর্ষণ করার কোনো যুক্তি আছে বলেতো মনে হয় না । একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, এর পেছনে একটা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার কাজ করছে । আমাদের সমাজে এখনও অবধি অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অনেকটাই যেহেতু পুরুষের হাতে সুতরাং সেখানে পুরুষের মনোরঞ্জন করাই বোধ হয় বিজ্ঞাপনদাতাদের একমাত্র লক্ষ্য । এরকম আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । একটি বিখ্যাত সুটকেস কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে যে, সুটকেসটি যে কত হালকা ও নির্ঝঞ্ঝাট তা প্রাণপণে প্রমাণ করার জন্য একটি অত্যন্ত স্বল্পবাস তরুণীকে দিয়ে সুটকেসটি বওয়ানো হয়েছে ।এর থেকে সেই সুটকেসের নির্ভরযোগ্যতা কতটা তা অবশ্য জানা যায় না কিন্তু ক্রেতার দৃষ্টি বোধ হয় সেই সুটকেসের তরুণীটির দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয় ।ধরা যাক আরও একটি বিজ্ঞাপনের কথা, সেখানে বলা হচ্ছে বলবর্ধক ওষুধ খেয়ে মায়েরা পরোক্ষভাবে তাঁর শিশুকে কতটা পুষ্ট করতে পারেন । এটা

দেখাবার জন্য স্তনদায়িনী মায়ের উন্মুক্ত বক্ষোদেশ দেখানো হয়েছে। এতে শিশুর পুষ্টি জানানোর চাইতেও পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দেবার তাগিদটাই যেন প্রবল হয়ে ওঠে।

আজও আমাদের দেশে শিশু যখন জন্মায় তখন থেকেই মা-বাবার মনে এক চিন্তা, ছেলে হলে বুড়ো বয়সে খাওয়াবে আর মেয়ে হলে তার বিয়ে দিতে গিয়ে দেনার দায়ে মাথা বিকোতে হবে। যৌতুক ও পণপ্রথা যখন নিন্দিত ও নিষিদ্ধ তখন আমাদেরই কয়েকটি ব্যাঙ্কের স্বল্পমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় পরিকল্পনায় কিন্তু উল্টো ভাবনাই প্রকাশ পায়। সেখানে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, তারপরেই ব্যাঙ্কের ঘোষণা—"মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমান, আপনার ভাবনা হালকা হয়ে যাবে।" এতে কিন্তু মেয়েদের সংসারের বোঝা হিসেবেই দেখানো হয়ে থাকে ও পরোক্ষ যৌতুক ও পণপ্রথাকেই কায়েম করতে সাহায্য করে। তবে নারীপ্রগতির ছাপ বিজ্ঞাপনে পড়েছে বটেই। মেয়েরা যে স্বাধীন এবং তারা যে নিজেদের ভার নিজেরাই বহন করতে পারে তার বোধ হয় একমাত্র প্রকাশ স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপনে। এই বস্তুটি যে একমাত্র চাকরিজীবী মহিলাদের (বিজ্ঞাপনেও তাই লেখা থাকে) পক্ষেই একমাত্র অপরিহার্য তা বোঝা যায়, বাদবাকি মেয়েরা কি এই চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে? দেখে শুনে ঈশ্বর গুপ্তের ছড়াটা একটু পালটে দিয়ে বলতে সাধ হয়—"আর কিছুদিন থাকোরে ভাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে। কেয়ার ভুলে ছুঁড়িগুলো সব হবেই হবে ফ্রী হবে।"

সিনেমার পর্দায় সাধারণভাবে মেয়েদের চেহারাও একইভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সিনেমার গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা

> *আমাদের সমাজে এখন অবধি অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অনেকটাই যেহেতু পুরুষের হাতে সুতরাং সেখানে পুরুষের মনোরঞ্জন করাই বোধ হয় বিজ্ঞাপনদাতাদের একমাত্র লক্ষ্য*

এটাকে একটা প্রমোদমাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই বাস্তবের বাইরে এক স্বপ্নের জগৎ তৈরি করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—যাতে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ভুলে সাধারণ দর্শক সেই অলীক রাজ্যে পালাতে পারেন। এই স্বপ্নের স্বর্গে হুরী-পরীদের দরকার ছিল, যারা চোখে মায়াকাজল লাগিয়ে দর্শকদের ঘুম পাড়াতে পারে। তাদের সুপ্ত শরীরী আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দিতে পারে। এইজন্য স্টারদের প্রয়োজন হল। তাদের জীবনযাপন, পোশাকআশাক, চলনবলন সব ঘিরেই এক মিথ তৈরি হল। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে অভিনেত্রীদের এই স্টার বানানোয় তাঁদের মহিমা কিন্তু বাড়ল না এবং ব্যবসার উপকরণ হিসেবে তাঁদের ব্যবহার করা হল। এখানেও মেয়েরা প্রধানত যৌনসামগ্রী। এটা পৃথিবীর সব দেশের সিনেমা সম্পর্কেই প্রযোজ্য, আমাদের দেশে তো বিশেষ করে। এদেশে ব্যাপারটা আবার একটু ইতর রকমের বাড়াবাড়ি। সেক্সের সুড়সুড়ি সারাক্ষণ দর্শককে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু কখনোই মহিলাটিকে পুরো নগ্ন [illegible] চলবে না, নগ্নতার একটা আলাদা সৌন্দর্য সব সময়েই আছে। কিন্তু আড়াল আবডাল দিয়ে রমণী শরীরের সমস্ত গোপন অংশ দেখানো রুচিবিকারেরই নামান্তর। তাছাড়া আজকাল বিদেশে বহু ছবিতেই পুরুষের নগ্ন শরীর দেখানো হচ্ছে, কেন তাহলে আমাদের দেশের ছবিতেই তথাকথিত সেক্স দেখাতে হলে মেয়েদের শরীরেরই বিভিন্ন অংশ ক্যামেরার নানা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাতে হবে? কখনও ক্লোজ আপ, কখনও লং শট একটি ছবিতে বোম্বের খ্যাত এক নায়িকা এক আদিবাসী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নায়িকা বস্ত্রবিপ্লবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, শরীরে কাপড় রাখতেই চান না, অথচ যেটুকু কাপড় শরীরে আছে সেটুকুও কিন্তু একবারে টিনোপলে সাদা। আমি তো জানি না, ভারতবর্ষের কোনো গ্রামে এভাবে কোনো আদিবাসী মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই বয়সে যুবতী মেয়েরা কিন্তু নিজেদের শরীর সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়। এরা যখন বিভিন্ন জায়গায় গতর খাটিয়ে কাজ করে তখন কেউ কি তাদের নিজেদের শরীর সম্পর্কে উদাসীন হতে দেখেছেন? একমাত্র সিনেমার পর্দাই এর ব্যতিক্রম, কারণ একখামচা উরু কিংবা একফালি বক্ষোদেশ চকিতের জন্য দেখিয়ে দর্শক-ভোলানো কারবারটা সিনেমা ব্যবসায়ীরা ভালই বোঝেন। তাছাড়া আগেই বলেছি এরমধ্যে একটা রূঢ় উদ্দেশ্যও আছে সেক্সের চমক দর্শকের কাছে ঘুমপাড়ানি বড়ি হিসেবে কাজ করে, এর ফলে দর্শক বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা ভুলে থাকতে পারেন এবং তাঁদের চিন্তাশক্তিও ভোঁতা হয়ে যায় পণ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও মেয়েদের আর একভাবেও সিনেমায় দেখানো হয়। সতীসাধ্বী স্ত্রী ও সর্বংসহা মাতা যিনি কিনা স্বামী পুত্র বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ লম্পট দুশ্চরিত্র এবং অত্যাচারী হলেও সবকিছু হাসিমুখে মেনে নিয়ে মানবিক গুণের পরাকাষ্ঠা দেখান, এই ধরনের মার্কামারা ছবিগুলোতে সব সময়েই পতিগৃহে নিগৃহীতা অবগুণ্ঠনবতী গৃহবধূর "মুঝে মাফ



কর দো" জাতীয় ইমেজ তৈরি করা হয়। আবার মজার কথা হল এই যে, এই জাতীয় ছবি দেখতে সবচাইতে বেশি ভিড় করেন আমাদের দেশের মেয়েরাই। আসলে এর কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অপমানিত হয়—শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর কাছে, বৃদ্ধ বয়সে ছেলের কাছে। তাই সিনেমায় যখন অন্য একটি মেয়েকে সেইভাবে অত্যাচারিত হতে দেখানো হয় বা তার অর্ধনগ্ন দেহের কুৎসিত প্রদর্শনী করা হয়, তখন মহিলা দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের স্যাডিস্টিক সুখ কোথায় যেন কাজ করে। ব্যবসায়িক থিয়েটারেও ক্যাবারে নাচের তোড়ে অভিনেত্রীরা যখন 'লাজ' রাখতে প্রাণান্ত আর থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে যখন সিক্তবসনা সুন্দরীর কদর্য অঙ্গভঙ্গি—তখন কজন মেয়ে ম্যাটিনি শোতে 'হাউসফুল' না করে তার সামান্যতম প্রতিবাদও করেন ?

আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করা গেছে—মেয়েদের মহিমাকীর্তন করতে গিয়ে অনেক পরিচালকই আবার তাঁদের স্বর্গভ্রষ্টা দেবী বানিয়ে ফেলেন। মেয়েরাও যে রক্তমাংসে এবং দোষেগুণে সম্পূর্ণ এক মানুষ—এ কথাটা অনেকেই ভুলে যান। দেবী বানানোর তাগিদে মেয়েদের মানবীসত্তা তাই চাপা পড়ে যায়। সেইজন্যেই আমাদের সিনেমায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের জীবনের নানা বাস্তব সমস্যা যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ, একাকিত্ব, স্বনির্ভরতা এবং বিবাহিতা নারীর প্রেম সব সময়েই ভাসা ভাসা এবং জোলো মেলোড্রামাতে পর্যবসিত হয়। আর সবকিছুর শেষে অনুশোচনা অনুতাপ পরিতাপ এবং গ্রুপ ফোটোগ্রাফে পুনর্মিলনের ছবি।

অবশ্য সব কথার শেষেও কথা থাকে। পুরুষেরা মেয়েদের কতটা মূল্য দিল, তার চাইতেও বেশি জরুরি মেয়েরা নিজেরা নিজেদের কতটা মূল্য দেয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ তো পুরুষই ছিলেন। নারীস্বাধীনতার নাম করে অন্তর্বাস পোড়ালেই ক সব সমস্যার সমধান হবে ? নারীপ্রগতির দুটো চেহারা আমরা এদেশে দেখি। একদল যাঁরা মুখে 'উইমেনস্ লিব'-এর বুলি কপচান, পার্কস্ট্রিট, বিভিন্ন ক্লাব ও পার্টিতে আসর মাত করেন, সোস্যাল ওয়ার্কের ফ্যাশনও বজায় রাখেন আবার মাঝে মাঝে সেমিনার করে বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজে নারীর ভূমিকা নিয়ে প্রবল তর্কবিতর্ক করেন। এঁরা কিন্তু আবার অফিসে স্বামীর পদমর্যাদা ও গাড়িবাড়ির ব্যাপারে সব সময়েই স্বামীর রিফ্লেকটেড্ গ্লোরিতে গ্লোরিফায়েড হতে খুবই পছন্দ করেন। আমার

মনে হয় এই ধরনের স্ত্রীস্বাধীনতায় স্বামীরা বেশ নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্তই বোধ করেন। কারণ এঁরা ভালভাবেই জানেন এঁদের দেওয়া অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ততা ও সামাজিক পদমর্যাদা ছেড়ে স্ত্রীরা কোনদিনই সত্যিকারের স্বাবলম্বী হবার চেষ্টাও করবেন না। এঁদের অনেকেই হয়তো বিয়ের আগে ভালই লেখাপড়া শিখে চাকরি করতেন কিন্তু বিবাহোত্তর সচ্ছল গৃহকোণের আশ্রয় পেয়ে প্রথম সুযোগেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এঁদের অনেকেরই ধারণা মেয়েদের চাকরি শুধু টাকা রোজগারের জন্য। কিন্তু টাকা ছাড়াও চাকরির মধ্যে যে স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতার স্বাদ

> *একমাত্র সিনেমার পর্দাই এর ব্যতিক্রম, কারণ একখামচা উরু কিংবা একফালি বক্ষোদেশ চকিতের জন্য দেখিয়ে দর্শক-ভোলানো কারবারটা সিনেমা ব্যবসায়ীরা ভালই বোঝেন*

আছে, একথা এই নারীপ্রগতির ধ্বজাধারীরা ভুলে যান। তাই সংসারের ঝকঝকে বিভিন্ন দামী আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও আর একটি শৌখিন আসবাব হয়ে শোভাবর্ধন করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। সিমন দ্য বোভা কিংবা ভার্জিনিয়া উলফ আমাদের দেশে তৈরি হতে এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

আর একদল হলেন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতা, সচেতন ও ইন্টেলেকচুয়াল মহিলা। মনোজ মিত্রের ভাষায়— "ইন্টেলেক্ট্ যাঁদের চোয়ালে এসে ঠেকেছে" এঁরা সবসময়েই মনে করেন সাংসারিক কাজকর্ম কিংবা সন্তানপালন করলেই তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। এঁদের মুখে ইংরিজির তুবড়ি ছোটে। জিনস্, মিডি, ম্যাকসি ছাড়া এঁরা পরেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঐতিহ্য রক্ষার মহান দায়িত্ব এঁদের উপর বর্তেছে বলে এঁরা নিজেদের ধন্য মনে করেন। বাস্তবে যখন মেয়েদের এই চেহারা, তখন বিজ্ঞাপনে, সিনেমা, থিয়েটারে বা বিভিন্ন মাধ্যমেও যে তাঁরা ব্যবহৃত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী ? তবে বাস্তবে আমরা এর ব্যতিক্রমও দেখি। এই দুই দল ছাড়াও মাঝামাঝি কিছু মেয়ে যাঁরা নিজেদের মর্যাদা, নিজেদের স্বাধীনতা, নিজেদের মূল্য সমাজের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেন, ধার করা বিদ্যের পরোয়া না করেই। নিজেদের জীবন থেকে শিখে যাচাই করে তাঁরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রতিফলন আমরা পাই বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমে— 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়া, 'মহানগর'-এর আরতি, 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতা, 'ভূমিকা'-র উষা, 'একদিন প্রতিদিন'-এর চিন্ময়ী, 'দূরত্ব'-র অঞ্জলি, 'দখল'-এর আম্বি, অথবা 'পুতুল খেলা'-র বুলু, এঁরা সবাই কিন্তু এই মেয়েদের প্রতিনিধি। তাই মেয়েদের আগে নিজেদের জানতে হবে, নিজেদের চাহিদা বুঝতে হবে আর সেইভাবেই আদায় করে নিতে হবে তাদের দাবি। বিভিন্ন মাধ্যমের কাজেও তাই নিজে থেকেই তাদের এগিয়ে আসতে হবে। মেয়েদের সমস্যা, তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা এবং সংকটের কথা মেয়েরা ছাড়া আর কেউ বেশি করে জানে না। মেয়েদের ইমেজ রক্ষার দায়িত্বও তাই একান্তভাবে মেয়েদেরই।

একটি সম্পূর্ণ পুষ্টিকর শিশু আহারে থাকা উচিত ঠিক ঠিক পরিমাণে সব কটি পুষ্টিকর উপাদান...



প্রোটিন
শরীর গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট
প্রাণচঞ্চল শক্তির জন্য।

ভিটামিন 'এ'
চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টির জন্য।

ভিটামিন 'বি' গ্রুপ
অর্থাত্ যাবতীয় পুষ্টিকর উপাদান উপযুক্তভাবে গ্রহণের জন্য।

ভিটামিন 'সি'
রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে।

ভিটামিন 'ডি'
ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস গায়ে লাগতে সাহায্য করে।

আয়রণ
সুস্থ রক্তের জন্য।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস
মজবুত হাড় ও সুস্থ সবল দাঁতের জন্য।

সেরেল্যাক একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহার- যা অত্যন্ত সুস্বাদু।

সেরেল্যাকে, প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেল ও ভিটামিন—এই পাঁচটি পুষ্টিকর উপাদানই আছে। প্রতিবারই আপনার বাচ্চাকে সেরেল্যাক খাওয়ানোর সংগে সংগে আপনি নিশ্চিন্ত যে তাকে আপনি সব কটি পুষ্টিকর উপাদানই সঠিক পরিমাণে দিচ্ছেন।



সব কটি পুষ্টিকর উপাদানই সমান প্রয়োজনীয়। কারণ সবগুলি এক সংগে কাজ করে। আর তাই আপনার বাচ্চার সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়েল আহারের যা সব কটি পুষ্টি গুণে "সম্পূর্ণ"। প্রত্যেকবার সেরেল্যাক খাওয়ানোর সংগে সংগে আপনার বাচ্চার সারা দিনের পুষ্টি—চাহিদার চার ভাগের একভাগ পূরণ হয়ে যাচ্ছে। পুষ্টির জন্য আপনাকে আর বাড়তি কিছু মেশাতে হবে না।

বুকের দুধই আপনার সন্তানের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু তার চার মাস বয়সে যখন শক্ত খাবার তাকে দেওয়া দরকার তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেরেল্যাক খাওয়াতে আরম্ভ করুন।

সেরেল্যাক®

এতে দুধ মেশানো আছে।



সেরেল্যাক তৈরী করে নেওয়া কি সোজা! শুধুমাত্র আগে ফোটানো কুসুম-গরম জল ঢালুন! মিশিয়ে নিন, নাড়ুন আর খেতে দিন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক শিশুর গ্রোথ চার্ট
এতে আছে, ওজনের চার্ট, রোগ-প্রতিরোধের রেকর্ড, শক্ত খাবার খাবার উপায় এবং আরো কত কি......
আপনার কপি পাঠাতে নীচের ঠিকানায় লিখুন:
সেরেল্যাক
পোষ্ট ব্যাগ নং ৩ নিউ দিল্লি-110008

SAA/FSL/C/3151 BEN

NESTLÉ.

মেয়েরা কি সত্যিই বিজ্ঞাপনের শিকার ?



দিব্যেন্দু পালিত

ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং কবি হিসেবে সুপরিচিত একালের অন্যতম প্রধান লেখক দিব্যেন্দু পালিত-এর আর এক পরিচয় তিনি বিপণন, বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পেশার জগতেও সর্বভারতীয় পরিচিতির অধিকারী। দেশে ও বিদেশে এই পরিচয়ে নানা সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি, বিশেষত ইংরিজি ভাষায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর নানা প্রবন্ধ।

বিজ্ঞাপনের পটভূমি এবং সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ইমেজ বিষয়ে এই নিবন্ধটি বিশেষভাবে 'সুকন্যা'র জন্য লিখে দিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ইমেজ ঠিক কেমন কিংবা ইমেজ বলতে কী বোঝায়—এসব নিয়ে কিছু বলবার আগে একটা মজার গল্প বলে ফেলি। গল্পটি শুনলাম এই সেদিন, রবীন্দ্রসদনে 'শাঁওলি'র 'নাথবতী অনাথবৎ' দেখতে গিয়ে, এক বান্ধবীরই মুখে।

বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, একমাত্র ছেলের বউ—শাশুড়ি তো মহাখুশি। সারাক্ষণ কাছে কাছে রাখেন তাকে, নানা গল্প করেন, রান্না শেখান এবং দুপুরের অবসরে তাঁর প্রিয় মহাভারত-এর স্বচ্ছন্দ সংস্করণের গল্প শোনেন বউয়েরই মুখে। আমাদের এই নতুন বধূটি অবশ্যই একালের মেয়ে—সরল, সাদাসিধে এবং কিঞ্চিৎ বাধ্য হলেও, কলেজে পড়া গ্র্যাজুয়েট, শাশুড়ির ভালোলাগা মন্দলাগার সঙ্গে নিজের ভালোলাগা মন্দলাগাকে মেলাতে পারে না ঠিকঠাক। তার ওপর মহাভারতের গল্পে তার আদৌ উৎসাহ নেই কোনো ; বরং স্মিতা পাতিল, শাবানা আজমী, রেখা, রাখীদের সম্পর্কে অনেক খবর রাখে, এমনকি এলিজাবেথ টেলর সম্পর্কেও। কলেজের কমনরুম থেকে শাশুড়ি ঠাকরুনের অন্তঃপুরে যে এতটা তফাত, মনে চাপা বিরক্তি নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবে সে, এটা আগেভাগে জানলে হয়তো বিয়েই করত না। যাই হোক, মহাভারতের গল্পও শেষ হলো একদিন। তখন দ্রৌপদী-ভাবে গদগদ শাশুড়ি জিজ্ঞেস করলেন, বউমা, কী শিক্ষা লাভ করলে বলো তো ? একপতির পত্নী বউমা ততোদিনে পৌঁছে গেছে বিরক্তির সীমান্তে। বলল, বুঝেছি মা, আমার এখনো আশা আছে—

নিতান্তই গল্প এটা, ইংরিজিতে যাকে বলি জোক। কিন্তু শুধুই কি জোক ? যে-শাশুড়িমাতা দ্রৌপদীকে মনে করেন পুণ্যবতী ও আরাধ্যা, বাস্তবে তিনি কি চাইবেন তাঁর স্নেহের পুত্রবধূটি হয়ে উঠুক দ্রৌপদীর কার্বন কপি ?

প্রশ্ন প্রশ্নই থাক, আমরা বরং ঢুকে পড়ি ইমেজের এলাকায়। ইমেজ বলতে কী বোঝায় তা কবি বা চিত্রকররা বুঝবেন একভাবে, সাধারণ মানুষ বুঝবেন আর একভাবে। সহজ কথায় 'ইমেজ' মানে 'ধারণা' বা প্রতিচ্ছবি। অমুকের ইমেজ ভালো বলতে বুঝব, অমুকের সম্পর্কে পাঁচজনের ধারণা ভালো। এই ধারণাটা গড়ে ওঠে নানাভাবে—সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে, শিক্ষা থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে, সমগ্রভাবে মানুষের মানসিকতা থেকে। একটা বিষয়ে আমার ধারণা ভালো হলে আপনারও যে তা-ই হবে তা তো নয়, যে যার নিজের মতো করে ধারণায় পৌঁছবো। এবং এই ধারণা পুরুষদের মধ্যে যেমনভাবে সৃষ্টি হবে, মহিলাদের মধ্যে তা নাও হতে পারে। কারণ, স্বার্থবোধই সৃষ্টি করবে পক্ষপাত।

শুধু বিজ্ঞাপনে কেন, ব্যক্তি বা কর্মের যে-কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষপাত সেই ব্যক্তি বা কর্মের ইমেজ নির্ণয়ে প্রভাবিত করে। আর 'ইমেজ' ব্যাপারটাও যত দিন যায় ততই নানা জনের নানা অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে যাচাই হতে হতে পালটাতে থাকে ক্রমশ। ইমেজ, সত্যি বলতে, ফ্যাশনের মতো—যা কিনা বদলাবার জন্যেই সৃষ্টি হয়। আরও বিশদ করে বলতে হয়, ব্যবহারিক জীবনে আমাদের কোন ব্যাপারটাই আর থেমে থাকছে এক জায়গায় ? বদল দেখা যাচ্ছে সর্বত্র এবং নিয়মিত।

মহিলারাও কি যা ছিলেন এক শো বছর কিংবা তারও আগে, আজও তেমনি আছেন, একই রকম ? মেয়েদের নিজেদের মনেই কি 'মেয়ে' বলতে ঠিক কী বোঝায়, পুরুষদের সঙ্গে তাদের—শারীরিক ও যৌন পার্থক্য ছাড়া—পার্থক্যটা কোন কোন ভূমিকায় এবং কেন, এসব নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি ? সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলতে তুলতে এবং পুরুষের সঙ্গে সহাবস্থানের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে নিতে নিজেদের তাঁরা এমনই একটা জায়গায় আজ পৌঁছে দিয়েছেন যে, শিক্ষিতা মেয়েদের অন্তত, আজকে আর সহজে পুরুষশাসিত বা পরনির্ভর বলা যাবে না। যে-কোনো সভ্য দেশে মেয়েরা আজ যথেষ্ট পড়াশুনা করছেন, চাকরি করছেন, স্বেচ্ছায় বিয়ে করছেন বা করছেন না, অন্যান্য নানারকমের স্বাধীনতা পেয়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন নিজেদের ; কোনো পেশাতেই তাঁরা পিছিয়ে আছেন এমন বলা যায় না ; ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এবং আরও নানা ধরনের খেলায় রপ্ত হয়ে উঠছেন ক্রমশ,যে-কোনো চেতনাসম্পন্ন দেশের রাজনীতিতেও মেয়েদের আজ বড়ো ভূমিকা। আছে এর পরেও। নারী-স্বাধীনতা বা উইমেন্‌স্ লিব-এর বিষয়টা কোথাও কোথাও মেয়েদের মধ্যে এমনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, নারীত্বের অন্যতম প্রধান চারিত্র্য, অর্থাৎ মাতৃত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠছে অনেকের মনে, কেউ বা ভাবছেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান ধারণ করলেই তো হয়—তার জন্যে কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার দরকার কী !

অবশ্য, মহিলাদের মধ্যে সকলেই যে একভাবে ভাবেন তা নয়, যাঁরা এগিয়ে ভাবেন তাঁদের মনে যাঁরা পুরনো ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসেন তাঁদের ইমেজটি কেমন ? কিংবা, উল্টোভাবে, যাঁরা 'ট্রাডিশনাল' তাঁদের মনে 'প্রোগ্রেসিভ' বা 'লিবারেটেডদের' ইমেজটি কেমন ? নিশ্চয়ই এক রকমের নয়। অবশ্যই দুই ধারার মধ্যে আছে বিরোধ, নাক-সিঁটকানো পরস্পর-বিরোধিতা।

এই যে ব্যাপারগুলো ঘটে গেল, বিশ শতকে এসে আমূল ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল মেয়েদের ভূমিকা এবং তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, চাল-চলন, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, পক্ষপাত এবং শেষবেশ তাঁদের ইমেজ, এটা আলাদা কোনো ঘটনা নয় ; এমনকি এই ঘটনাগুলিও এককভাবেও ঘটেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে 'আজ থেকে আমি বদলে যাবো' ভাবলেই কেউ বদলে যায় না। এর পিছনে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে, কাজ করে আরও নানা পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের সূত্রে অনেক সময় জড়িত থাকেন পুরুষরা। কখনো বা মেয়েরাও। তার চেয়ে বড়ো কথা, সেই পরিবর্তনের পটভূমি প্রস্তুত করে দেশ, সমাজ, অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং নানা ধরনের



আবিষ্কার—যেগুলির সম্মিলিত প্রভাব ক্রমশ আবিষ্কার করে আরও বেশি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, জীবনযাপনের নানা ক্ষেত্রে নিত্য নতুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা। এইভাবেই ভোগ ও ভোগ্যবস্তু সম্পর্কে ধারণা পালটাতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পালটাতে থাকে কোনটা কার পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়, কোনটা পুরনো, কোনটা নতুন এবং কোনটা একেবারে নতুন সে-সম্পর্কে ধারণা। এই ধারণাগুলিকে মূলধন করেই ইতিমধ্যে গড়ে-ওঠা বাণিজ্য মেতে ওঠে প্রয়োজন ও চাহিদা সৃষ্টির কাজে। মন যেখানে প্রস্তুত, সেখানে মগজে ঘা মেরে কাজ হাসিল করা কী আর এমন শক্ত? ইন্ডাস্ট্রি তার স্বত্ব ঠিক রাখতে এবং মুনাফা বাড়াতে যা যা তৈরি করবে, সেগুলি গুদামজাত করে রাখলেই চলবে না—সেগুলির জন্যে চাহিদা সৃষ্টি করে যতো শীঘ্র সম্ভব বিক্রি করে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে প্রলোভন দেখিয়ে। বিক্রির জন্যে চাহিদা ও প্রলোভন সৃষ্টির কাজটি বিজ্ঞাপনই পারে এবং বিজ্ঞাপনই করে।

বিষয়টি জটিল এবং দু চারটি মন্তব্যে সেরে ফেলার নয়। কিন্তু একটি ব্যাপার বুঝে নেয়া দরকার। তা হলো, বিজ্ঞাপন করার জন্যেই কেউ বিজ্ঞাপন করেন না—বিজ্ঞাপন সম্পর্কে ভাবনা শুরু হবার পর থেকে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যেসব পরিবর্তন এসেছে তা হঠাৎই আসেনি, তার পিছনে কাজ করেছে প্রচার ছাড়াও নানা সামাজিক ও অন্যান্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ইমেজও পালটেছে। শুধু মেয়েদের ইমেজই বা বলব কেন, পালটেছে পুরুষদের ইমেজ, পালটেছে সমগ্রভাবে সমাজের কিংবা দেশের ইমেজও। আধুনিক যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞাপন-সম্পর্কিত ভাবনাও হয়েছে আধুনিক, ভাঙচুর হয়েছে সংস্কারে, সাধারণভাবে মানুষের গ্রহণক্ষমতা ও মানসিকতা যত উদার হয়েছে, ততই এসেছে ইমেজ তৈরির ব্যাপারে নতুন ভাবনা। ব্যাপারটি সুপরিকল্পিত, কারণ, মনে রাখতে হবে বিজ্ঞাপন বা 'অ্যাডভার্টাইজিং' উন্নত দেশগুলিতে, (যার মধ্যে ভারতবর্ষও আছে) কার্যকর হয়েছে ইন্ডাস্ট্রির আকারে। বিজ্ঞাপন একই সঙ্গে 'আর্ট' এবং 'সায়েন্স', এই ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনায় আছেন অনেক শিক্ষিত, মাথাওলা ও মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, বিপণন, শিল্পকলা, মুদ্রণ, ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলা। যা বিজ্ঞাপিত হবে এবং যাঁদের জন্যে বিজ্ঞাপিত হবে—উভয় বিষয়েই তাঁদের থাকে সুস্পষ্ট ধারণা। বলা বাহুল্য, এঁদের কাজ সহজ নয়। কারণ একই সময়ে এঁদের ভাবতে হয় অনেকের কথা—পণ্যের কথা ভাবলে পণ্যের ভোক্তা ও ক্রেতাদের কথা, যাঁদের মধ্যে থাকেন এই রচনার শুরুতে গল্পের ছলে বলা শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মতো ভিন্ন সময়, বয়স ও মানসিকতার, পরস্পরবিরোধী চরিত্র, আছেন উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত, আছেন ব্যক্তি কিংবা যৌথভাবে পরিবার, আছেন শুধুই পুরুষ কিংবা শুধুই মহিলা ইত্যাদি। অনেকের বিভিন্নতা জুড়ে এই যে সমগ্র, এঁরাই বিজ্ঞাপনের ভাষায় audience. যে-কেউই বুঝতে পারবেন, এই স্পেশালাইজেশনের যুগে গোটা অডিয়েন্সের জন্যে কোনো বিজ্ঞাপন তৈরি হয় না। ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনের কথাই ধরা যাক। সব পণ্যে কি স্ত্রী-পুরুষ-বয়স-মানসিকতা নির্বিশেষে সবাই ব্যবহার করেন? কখনোই না। পুরুষের জন্যে যেমন ধুতি, তেমনি মেয়েদের জন্যে শাড়ি। শিশুর জন্যে বেবিফুড, বয়স্কের জন্যে ওয়াটারবেরিজ কম্পাউন্ড। গোটা পরিবারের জন্যে হরলিকস। এই যে বিভিন্ন জনের জন্যে বিভিন্ন জিনিস, এই জিনিসগুলি যাদের জন্যে, ঠিক তাদের কাছেই পৌঁছবার জন্যে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায় আমদানি করা হয় 'ইমেজ', বিজ্ঞাপনের ছবিতে ব্যবহার করা হয় ঠিক চেহারার ঠিক মডেলটি কখনো একক, কখনো বা যৌথভাবে—এবং অন্যান্য চারিত্রিক অনুষঙ্গ, যাতে বিজ্ঞাপিত জিনিসটিও পেয়ে যায় যথাযথ ইমেজ। লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনের ছবিতে অবশ্যই থাকবেন সুন্দরী যুবতী, যা ওই বয়স ও সামাজিক স্তরের অন্যান্য যুবতীদের আকর্ষণ করে ওই বিশেষ নাম বা ব্র্যান্ডের লিপস্টিকটিই কেনার জন্যে—লিপস্টিক- চর্চিত সুন্দর দুটি ওষ্ঠই এখানে পাবে প্রাধান্য। বেবিফুডের বিজ্ঞাপনে দেখাতে হবে নাদুস-নুদুস, আহ্লাদে আটখানা শিশুকে, সম্ভব হলে তার মাকেও—নির্দিষ্ট বেবিফুডটি কেনার সিদ্ধান্ত যে শিশুর মাকেই নিতে হবে! আফটার শেভ লোশনের বিজ্ঞাপনে দেখাতে হবে মসৃণভাবে দাড়ি কামানো এক সুপুরুষ যুবাকে—মুগ্ধ চোখে তাঁর দি[illegible] যদি এক পরমাসুন্দরী তাকিয়ে থাকেন, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। স্বামীর জন্যে কিংবা প্রেমিকের জন্যে ওই সুন্দরী মহিলাই হয়তো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের জিনিসটি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন কিংবা সুপারিশ করবেন। ওইরকম; দৈনিক কাগজে, পত্রপত্রিকায় কিংবা টেলিভিসনে যত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, তাদের প্রত্যেকটিতেই চলেছে ভোক্তা বা কনজিউমারের ইমেজ তৈরি করে প্রোডাক্ট বা ভোগ্যবস্তুটিরও ইমেজ গড়ে তোলার চেষ্টা। অর্থাৎ প্রোডাক্টের বাঞ্ছিত ইমেজ কেমন হবে তার ওপরেই নির্ভর করছে মডেল ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলির ইমেজ।

বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ইমেজ কেমন, এ-প্রসঙ্গে ভাবতে হলে, তাই, সমগ্র বিজ্ঞাপন ব্যাপারটিকেই বুঝতে হবে আগে, বুঝতে হবে কেন বিজ্ঞাপন এবং কী তার লক্ষ্য, বুঝতে হবে বিজ্ঞাপিত বস্তুটি কী এবং সেটি কোন আর্থিক, সামাজিক, বয়স, শিক্ষা, রুচি ও মানসিকতার মেয়েদের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে বিজ্ঞাপনের বার্তা (message) এবং দৃশ্যাদি (visual elements); কোন ভঙ্গিমায়, কোন প্রয়োজনে কোন ধরনের মডেলকে ব্যবহার করা হলো ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, যে-কোনো উন্নত মানের বিজ্ঞাপনেই লক্ষ্যের (objective) কথা মনে রেখে ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটানো হয়—যাতে চোখে পড়ে এবং মনে ধরে; এবং বিজ্ঞাপিত বস্তুটি ব্যবহার ও ক্রয়ের দিকে ঝোঁক পড়ে।

তবে, কথা হলো, বিজ্ঞাপনে মডেল ও ভঙ্গিমা হিসেবে মেয়েদের একটু বেশিই ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনে; কখনো বা এড়ানো চলত এমন ক্ষেত্রেও। কারণ খুবই সহজবোধ্য। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এমনকি নৈতিক ক্ষেত্রেও, নানা ধরনের স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও মেয়েরা এখনো যেটা হারাতে পারেননি, তা হলো তাঁদের সৌন্দর্য, রূপ, মোহিনী মায়া। চুল, চোখ, ভুরু, নাক, ঠোঁট, চিবুক, গ্রীবা, স্তন, কোমর, নিতম্ব—এককথায় মেয়েদের সমগ্র শরীর শুধু যৌনতার প্রতীকই তো নয়; সৌন্দর্যপিপাসুর চোখে নারীর শরীর সুদূর অতীত থেকে এই রূঢ় বর্তমান ও স্বেচ্ছাচারিতার যুগ পর্যন্ত সৌন্দর্যেরই প্রতীক। নারী মানেই মোহিনী এবং নারী অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণের 'উপাদান'। বিজ্ঞাপন নিয়ে যাঁরা ভাবেন, মেয়েদের এই প্রচন্ড আকর্ষণের ক্ষমতাটিও তাঁদের অজানা নয়। সৌন্দর্য বিজ্ঞাপনের বড়ো উপাদান।

এই 'আকর্ষণ'-টিকেই ব্যবহার করতে গিয়ে কখনো কখনো কোনো কোনো বিজ্ঞাপনদাতা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন, ধাক্কা দিয়ে যান রুচি, শোভনতা ও সৌন্দর্যবোধে। তাঁরা তিরস্কৃতও হন। কিন্তু, সাধারণভাবে, ভারতীয় বিজ্ঞাপনে যে-ইমেজে মেয়েরা উপস্থিত হন, তা কি সত্যিই ভালো নয়?

গ্ল্যামার দুনিয়ার অন্দরমহল



সুজাতা মেহতা

বিজ্ঞাপন, মডেল, ছবি। এই শব্দগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যামার, ফ্যাশন আর বৈভবের এক বর্ণময় ছবি চোখে ভেসে ওঠে। খবরের কাগজে আর সিনেমায় আমরা সাধারণ মানুষ বিজ্ঞাপনের বাহারটুকুই দেখি। মডেল মেয়েরা মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাদের মাত করে দেন – যে বস্তুই তাঁরা হাতে করে এগিয়ে দেন আমরা কিনে কৃতার্থ হই। কি চমৎকার সব বাড়িতে তাঁরা থাকেন, কি সুন্দর ছিমছাম তাঁদের সংসার, কি সুখেই না তাঁরা গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজগুলো করেন!

কিন্তু এ সবই তো অভিনয়, আর এই সাজানো বাগানে মডেল মেয়েদের হাসিটাও সাজানো। বিজ্ঞাপন যিনি দেন তিনি তো যে কোনোভাবে ক্রেতাদের মন টানবেন। গ্ল্যামার গার্লরা এঁদের হাতের পুতুল। মডেল মেয়েদের এঁরা যেভাবে খুশি ব্যবহার করেন।

এই মডেলদের জীবন কি-রকম? আসলে তারাও মানুষ, সাধারণ মেয়ে – তফাত এই যে, তাদের চেহারা অন্য সকলের থেকে তাদের পৃথক করে রেখেছে। বিজ্ঞাপন-দুনিয়ার রং মুছে ফেলার পর তাদের গ্ল্যামারও থাকে না। মানুষ হিসেবে এই মেয়েরা সহৃদয়, মিশুক, তাদের নিজস্ব কিছু ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে আর থাকে কিছু উচ্চাশা। কেউ কেউ মডেলিং-এর জগতে এসে পড়েন নিছক শখ করে, কেউ নিতান্ত দুর্ঘটনাক্রমে হয়ে যান পেশাদার মডেল।

পেশাদার মডেল। কথাটা শুনতে বেশ লাগে। অন্য যে কোনো পেশার মত মডেলিংও একটা কঠোর দুনিয়া। এই দুনিয়ার সবটাই পশ্চিমী দুনিয়ার ছাঁচে ফেলা। এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার চেয়ে পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি দরকার বেশি। এখানে পয়সা বেশি, মডেলদের প্রতি ব্যবহার ভাল। তবে মডেলিং-এর চাহিদা, হাঁকডাক, বাজার সবই হলো বম্বেতে। ব্যবসা বম্বেতে, কাজেই বিজ্ঞাপনও সেখানে। শুধু ফিল্মী জগতের তারকারাই নন, উদীয়মান মডেলদেরও আবির্ভাব হয় বম্বের আকাশে।

বিজ্ঞাপন জগতের প্রায় সব লোক সুজাতা মেহতাকে ভাল করে চেনেন। ম্যাগি নুড্‌লের বিজ্ঞাপনে এই সুজাতা হলেন মাতৃরূপিণী। তিনি কিন্তু এখনও মা হতে পারেননি – তাঁর বয়স ২৪, এখনও বিয়েই হয়নি। সহজ মেয়ে সুজাতা মডেল-জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প বললেন, অবশ্য দুঃখ তাঁকে কিছুই পেতে হয়নি।

সুজাতা প্রথমে ছিলেন মঞ্চের অভিনেত্রী। গুজরাতী নাটকে বেশ নাম করেছিলেন। প্রায় বারো বছর অভিনয় নিয়েই ছিলেন। তারপর মডেলিং-এর শুরু কি করে হলো? – 'ওঃ, একদিন চলচ্চিত্র-নির্মাতা গিরিশ খানেকারের সঙ্গে পরিচয় হলো। উনি বললেন একটা টেস্ট দিতে। বিশ্বাস করতে পারবেন না – যেদিন তাঁর অফিসে যাচ্ছি, লিফটের মধ্যে আর এক বিজ্ঞাপন সংস্থা নিও ফিল্মসের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওঁরাও বললেন একটা টেস্ট দিতে। তখ্‌খুনি!' এইভাবে-নিও ফিল্মসের সার্ফ ছবিতে সুজাতা মেহতার আত্মপ্রকাশ হলো।

তারপর থেকে সুজাতার আর বিশ্রাম নেই – বম্বের বড় বড় বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রায় সকলের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। 'খবরের কাগজে আমার ছবি কমই পাবেন। বেশিরভাগ মডেল তো ফ্যাশন শো দিয়ে শুরু করে, তারপর পত্রিকার পাতায় ওঠে। ফিল্মে আসে তারপর। আমার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো – সোজা এসে নামলাম সিনেমার পর্দায়।' সুজাতার সুবিধে হলো উনি অভিনয় জানেন। 'ঝোঁকটা এখন অন্য-দিকে। শুধু ভাল দেখতে হলেই চলবে না, এখন সবাই চায় ফিল্ম বা টেলিভিসনের মডেল একটা ব্যক্তিত্ব আরোপ করুক।'

চার বছর আগে 'সার্ফ' দিয়ে সুজাতার মডেল-জীবন শুরু হয়েছিল। এরপরে বেগন স্প্রে, এরাসমিক ব্লেড, এ-ও-নারকেল তেল, ভিক্‌স ভেপোরাব, কোলগেট টুথ পাউডার আর ম্যাগি কতরকম কাজই তো করেছেন। মডেলিং-এর কাজ সুজাতার ভাল লাগে। 'মনে মনে আমি সর্বদা ফিটফাট। যে কাজ পারব না সেটা করব না। শুধু টাকার জন্য কিছু করব এটা আমার ইচ্ছে নয়। মন চাইলে তখনই কাজ নিই।'

এখান থেকে পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গ উঠল। 'কাজটা কি ধরনের, বিক্রির জিনিসটা কী – এসব দেখে তবে পারিশ্রমিক। প্রাত্যহিক ব্যবহারের জিনিস হলে আমার রেট একরকম, অন্য ছবিতে আর এক রকম।' সুজাতা জীবনে যা কিছু পেয়েছেন কোনো কষ্ট না করেই পেয়েছেন। তাঁকে স্ট্রাগল করতে হয়নি, নিজের ছবি নিয়ে বিজ্ঞাপন-সংস্থার দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়নি। 'লোকে নিজের থেকে আমার খোঁজ করেছে। মুখে মুখে আমার পরিচিতি ছড়িয়ে গেছে।' এক নবাগতা অভিনেত্রীর পক্ষে এই সাফল্য একটা বিস্ময়ের কথা।

মঞ্চের জীবন নিয়েও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। 'গড়ে মাসে ১২/১৩টি অভিনয় করি। নিয়মিত রিহার্সাল আছে।' কথা বলে মনে হয়, মডেলিং সুজাতার জীবিকা হলেও মঞ্চই তাঁর জীবন। নিজে মডেল হয়েও অন্য মডেলদের সঙ্গে তিনি খুব একটা মেলামেশা করেন না। মডেলিং সম্পর্কে তাঁর কোনো অভিযোগ আছে? 'ওঃ, এই সাজগোজ করে বসে থাকা আর সব ছবিতে মা সাজা এক যন্ত্রণা।' ফ্যাশন শো তিনি করেন না, তাই সব মডেলকে তিনি চেনার সুযোগ পান না। 'যে কজনকে চিনি সবার সঙ্গে হৃদ্যতা আছে। কতটুকুই বা মডেলের জীবন! খুব ভাল যদি হতে পারেন তো দশ বছর। কমবয়সী মডেলদের মধ্যে এখন দারুণ কমপিটিশন। মডেলের পেশা এখন সম্মানজনক পেশা!'

মডেলিং-এর জগতে আজ পর্যন্ত তাঁকে কোনো বাজে ঘটনায় পড়তে হয়নি, একথাটা সুজাতা বেশ জোর গলায় বলেন। 'সবই

নির্ভর করে আপনার নিজের হাবভাব, কথাবার্তার ওপর।' মডেলিং-এর কাজ সর্বদা সমান যায় না – কখনো যেমন খুব চাপ থাকে তেমনই কখনো কখনো কাজ থাকেই না। সুজাতা এখন টেলিভিসনে হিন্দুস্থান লিভারের একটা কাজ করছেন। আর একটা বড় ঘটনা ঘটতে চলেছে। তাঁর অভিনীত মঞ্চসফল গুজরাতী একটি নাটক শীঘ্রই হিন্দি ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে মুক্তি পাবে। ছবির নাম 'চিৎকার'। এ ছবিতেও সুজাতা আছেন – এবং কাহিনী-চিত্রে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। আর মডেলিং করবেন না? সুজাতা হেসে বললেন, 'তা কেন? যতদিন ভাল লাগবে মডেলিং করে যাব।'

জুহি চাওলা ছিলেন ১৯৮৪ সালে ফেমিনার মিস ইণ্ডিয়া, তারপর আমেরিকার মায়ামিতে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধি। জুহির বয়স মাত্র কুড়ি, আর মডেল বলতে যা বোঝায় সেরকম চালচলনও তার নয়। জুহি খুব খোলামেলা স্বভাবের মেয়ে। হবেই তো, সে এখনও বম্বের সাইডেনহ্যাম কলেজে বি কম ক্লাসের ছাত্রী।

১৯৮২ সালে ওর কাজ শুরু হয়েছিল। এক আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় জেসি কুইন নির্বাচিত হয়ে জুহি বুঝতে পারে তার প্রতিভার কথা। এর পরেই এক ফ্যাশন শোতে মডেল হওয়ার ডাক আসে। তারপর আসে বিজ্ঞাপনে মডেলিং-এর ডাক। সেটা ১৯৮৩ সাল।

না, বাড়ি থেকে কোনো বিরোধিতা আসেনি। আমাদের জীবনে ধ্যান-ধারণা যে বদলে যাচ্ছে এটা তার একটি প্রমাণ। জুহির বাবা আয়কর দপ্তরে উচ্চপদে আসীন ছিলেন, মা তাজ হোটেলে হাউস কীপিং-এর নির্দেশক। 'শরীর দেখাতে না হলে তাঁদের আপত্তি ছিল না।'

আফগান স্নো দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর আইসক্রীম, ক্রমে ল্যাকমে.....জুহির খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ফেমিনা প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার আগেই সে ছিল সফল মডেল। অবশ্য তারপর থেকে অফারের অভাব নেই।


জুহি চাওলা



'মডেলিং-এর কাজটা কিন্তু একেবারে পরিষ্কার। জানি না কি করে এ সম্পর্কে মানুষের মনে বাজে ধারণা হয়। যতক্ষণ আপনি নিজে পরিষ্কার থাকবেন ততক্ষণ কোনো সমস্যা নেই। ভাল এজেন্সি ছাড়া যাবেন না, আর না দেখেশুনে কাজ নেবেন না। তাহলেই হলো। টাকাপয়সা ভালই হয় – তবে পেতে দেরি হয় এই যা।' জুহি হাসলেন।

মডেলিং-এর জগতে যারা নতুন আসছে তারা কি করবে? 'বড় এজেন্সিগুলোতে নিজের ফটো দিয়ে আসুন। ঘুরতে হবে। সহজে কি হয়? কোথায় যাওয়া দরকার জানতে হবে, কার কাছে যেতে হবে, কিভাবে – সব জানতে হবে। যখন আমি প্রথম এসেছিলাম একটা লোককেও চিনতাম না।'

মডেলিং-এর কাজে কতটা শ্রম দিতে হয়? 'আজকাল এটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। দেখুন না, পড়াশোনা করতেই পারছি না। পরীক্ষার সময় মুশকিল হয়।'

পাশ করার পর কি করবেন? জুহির ইচ্ছে গ্র্যাফিকস চর্চা করেন। 'না, মডেলিংকে সব-সময়ের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করব না। এ কাজের তো কোনো ঠিক নেই, তাই এর ওপর সর্বদা নির্ভর করা যায় না। পার্ট-টাইম কাজ হলে ঠিক আছে। একমাত্র নন্দিনী সেন বা অ্যানা ব্র্যাড-মেয়ারের মতো মডেল দীর্ঘদিন এ লাইনে টিকতে পেরেছিলেন।

'ইউরোপ-আমেরিকায় মডেলিং-এর ব্যাপারটা পুরোদস্তর পেশাদারী। ঘণ্টা মেপে টাকা। এখানে......ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখে, ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আর পয়সা দেয় পুরো কাজ হিসেব করে।' এখন অবশ্য জুহি চড়া দাম হাঁকতে পারেন। তবে যখন ওই দাম পাওয়া যায় না, তখন জুহি আপস রফা করতে অনিচ্ছুক নন।

মডেলিং-এ তিনি কত সময় দিয়ে থাকেন? ফ্যাশন শো, পত্রিকা, ফিল্ম/টেলিভিসন মিলিয়ে খুব বেশি হলে সপ্তাহে তিন কি চার দিনের পুরো কাজ থাকে। গরমের সময় তেমন কাজ থাকে না। তাই তখন তাঁর অন্যান্য হবি – গান, চলচ্চিত্র, কমিকস – এগুলোর চর্চা করেন।

সুধা শেঠ

কলকাতার দুজন মডেল

রোমা ফুটনানি

কলকাতায় যেসব মডেল সবথেকে বেশি কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন রোমা ফুটনানি নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নেসকাফে, তাজ টি, কেয়ো কার্পিন হেয়ার অয়েল, তুহিনা, বোরোলীন, পন্ড'স্, ভেসলীন টনিক, সোনালি সাবান, ইমামী সাবান এরকম অনেক বিজ্ঞাপনেই রোমার সুন্দর মুখের জয়জয়কার। শুধু পত্র-পত্রিকায় ছাপার বিজ্ঞাপন নয়, রোমা বেশ কয়েকটি অ্যাড-ফিল্মও করেছেন। তার মধ্যে আছে সোনালি সাবান, উইলস ফিল্টার সিগারেট, রবিনসন বার্লি এবং রেড লেবেল (এক্সপোর্ট) টি।

এতগুলো বিজ্ঞাপনে মডেল হওয়ার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে তাঁর নিজের মুখেই শুনছিলাম মডেলিং-এর নিয়ম কানুন, সুবিধা-অসুবিধা। 'মডেল হওয়াটা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়, বরং বেশ সোজা। নিজের কয়েকটি ছবি নিয়ে বিজ্ঞাপন এজেন্সীগুলোতে দেখা করে নিজের ইচ্ছার কথা জানালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক পাওয়া যায়। তারপর যোগাযোগ রেখে চলতে হয় এবং সত্যি ভাল মডেল হলে অনেক কাজ পাওয়া যায়।'

'মডেল হতে হলে যে সবসময় সুন্দরী ষোড়শী হতে হবে তার কোনো মানে নেই। ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্কা মহিলা সকলেরই চাহিদা আছে।'

বাবা ফরেন এমবাসীতে চাকরি করতেন, তাই রোমার স্কুলজীবন কেটেছে কানাডা, পাকিস্তান এবং ঢাকায়। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বিয়ে পাশ করেন। এরপর আর পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি, কারণ বাঙালি মেয়ে রোমা তখন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন ফুটনানি পরিবারের ছেলের সঙ্গে।

মডেলিং আরম্ভ করেন ১৯৭৬ সাল থেকে। প্রথম কাজ নেসকাফে। কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে মডেলিং। তবে কলেজ ফাঁকি দিয়ে নয়, ক্লাসের পরে। '৭৯ সালে গ্র্যাজুয়েট হলেন, '৮০ সালেই বিয়ে। বিয়ের পর একবছর শ্বশুরবাড়ির আপত্তিতে কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। স্বামীর উৎসাহে আবার কাজ শুরু করেন এবং তখন আর কেউ আপত্তি করেননি।

'কলকাতায় কোনো পেশাদার মডেল নেই, কারণ কলকাতায় যথেষ্ট কাজের অভাব। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনই কলকাতার বাইরে তৈরি হয়, আর যাওবা কিছু এখানে হয় তার মধ্যে অনেকগুলোই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট। এছাড়াও আছে টাকার ব্যাপার। বম্বে, দিল্লির তুলনায় কলকাতার মডেলরা অনেক কম টাকা পান। সুতরাং এখানে মডেলিংকে পেশা করার প্রশ্নই ওঠে না, হবি হিসাবেই রাখতে হয়।'

সারা মাসে কটা কাজ আপনারা করেন?

'কাজের কোনো ঠিক নেই। বিজ্ঞাপনের একটা অফ-সিজিন আছে, সে সময় সাধারণত কোনো কাজ হয় না। অন্য সময় কোনো মাসে আটটা, আবার কখনো একটা – এইভাবেই চলে। বছরের শেষে ক্যালেন্ডারের জন্য কাজের ব্যস্ততা থাকে।'

মডেলিং-এর পারিশ্রমিক নির্ধারণ হয় কীভাবে?

'এর কিছু বাঁধাধরা নেই। প্রথম দিকে তো মডেলরা কিছু বলতেই পারেন না। পরে একটু পরিচিতি বাড়লে চাহিদা বাড়ানো যেতে পারে। তবুও সেটা খুব বেশি নয়। এত পুরনো হওয়ার পর আমি একটা বিজ্ঞাপনের জন্য দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা পেয়ে থাকি। বম্বেতে অনায়াসে এর ডবল টাকা পাওয়া যায়। অবশ্য একথা মানতেই হবে, ওখানকার মডেলরা অনেক বেশি পারফেক্ট এবং প্রোফেশনাল।'

কখনো লাইভ-মডেলিং করেছেন?

'পাঁচ-ছটা করেছি। তবে লাইভ-শো আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া রিহার্সাল দেওয়ার সময়ও আমার হয় না। সংসার এবং চাকরি সামলে লাইভ-শো করা

মুশকিল। আমার চাকরিও হোটেলে। তাই আট ঘণ্টা ডিউটি, তাও আবার শিফটিং।'

কতদিন চাকরি করছেন?

'গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে। এটাই প্রথম চাকরি।'

মডেলিং-এর জন্য কী কী অপরিহার্য?

'সুন্দরী না হলেও সুশ্রী হওয়া দরকার। সেইসঙ্গে তাকে জানতে হবে কী করে ভাল মেকআপ করতে হয়। পোশাকের ব্যাপারেও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ এ সবকিছুই নিজেকে করতে হয়।'

কোনো ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে কি?

'সেরকম কিছু প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমি একটা গ্রুমিং এবং বিউটিফিকেশনের কোর্স করেছি অবশ্য সেটা নেহাতই শখে,



মডেলিং-এর জন্য নয়।'

মডেলিং-এর অসুবিধাগুলো কীভাবে নেন?

'সব কাজেরই সুবিধা-অসুবিধা আছে। বিশেষ করে মহিলাদের ওপর সবাই অ্যাডভানটেজ নেওয়ার চেষ্টা করে। আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। নিজে ঠিক থাকলে কেউ খারাপ চোখে তাকাতেও সাহস করে না। আর মডেলিং করা মানেই শরীর দেখানো নয়। আমার তো মনে হয় অনেক মেয়ে ভুল ধারণাবশত মডেলিং-এ এগিয়ে আসেন না। অথচ এখনও নতুন মুখের চাহিদা খুব বেশি।'

বিজ্ঞাপনে মেয়েদের পণ্য করে তোলা হয় – এই অভিযোগ সম্পর্কে আপনার কী মত?

'অভিযোগটা আংশিক সত্যি। যেসব বিজ্ঞাপনে মহিলার প্রয়োজন নেই, যেমন ধরুন জেনারেটর, সেখানে খুব সেক্সি পোজে একটি মেয়েকে বসিয়ে দেওয়াটা অর্থহীন। কারণ জেনারেটরের সঙ্গে মহিলার কোনো সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে মেয়েদের পণ্যসামগ্রী ভাবা চলে। কিন্তু কোনো মহিলা চা খাচ্ছে –সেখানে কোনো অভিযোগ চলে না।'

ঝুমুর কুমারী

অরুন্ধতী মুখার্জি

টিভোলি কোর্টের ন'তলায় ছিমছাম সাজানো ফ্ল্যাট। বেল বাজাতেই যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনিই অরুন্ধতী মুখার্জি – কেয়ো কার্পিন এবং বম্বে ডাইং-এর একটি ছোট বিজ্ঞাপনের মডেল। অরুন্ধতী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রী, একটি গ্রুপ থিয়েটারে নাটকও করেন।

তাঁকে বললাম, প্রথমেই খুব মামুলি একটা প্রশ্নে আসতে হচ্ছে – শখ করে মডেলিং করেন, না এটাই আপনার পেশা?

অরুন্ধতী বললেন – 'না, একেবারেই পেশা নয়। মডেলিং-এর কাজটা বড্ড সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ধরুন এক-একটা শুটিং করতে পুরো ৭/৮ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। It takes quite a long time. অত সময় কোথায় বলুন! আমার তো কলেজ আছে।'

মডেলিং-এ আগ্রহ কেমন করে এলো?

'শুধু experience করতে চেয়েছিলাম মডেলিং-এর কাজটা কেমন। Lintas-এর সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। এদিকে Thought Shop বলে একটা এজেন্সী আছে – এটা হল দিলীপ কাক্কারের স্ত্রী মীরা কাক্কারের। মীরা কাক্কার Lintas-কে contact করেন, Lintas আমার নাম বলে। তখন উনি আমাকে contact করেন।'

কেমন অভিজ্ঞতা হল?

'ভীষণ boring। একদম enjoy করা যায় না। বড্ড time consuming ব্যাপার। যা ভেবে ছিলাম ঠিক তার উল্টো।'

আচ্ছা, এতে পারিশ্রমিক কেমন পাওয়া যায়?

'আমি তো মাত্র দুটো কাজ করেছি। তার মধ্যে কেয়ো কার্পিন খুব ভাল pay করেছিল। আর বম্বে ডাইং-এর বিজ্ঞাপনটা একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ করিয়েছিলেন এই কলকাতা থেকেই – কাজেই outstanding কিছু payment আমার আশা করা উচিত নয়।'

মডেলিং সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করেন?

'একেবারেই না।'

মডেলিং-এ মেয়েদেরই কেন বেশি ব্যবহার করা হয় –পুরুষ পরিচালিত সমাজ বলে, না অন্য কিছু?

'এটা আমার মনে হয়, মেয়েদের attraction obviously বেশি। যে-কোনো product sale করতে হলে mass-কে attract করাতেই হবে। সেক্ষেত্রে মেয়েদের দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি করাটাই মনে হয় অনেক কার্যকরী হয়।'

মডেলিং সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

'যে কোনো developing country-তে বিজ্ঞাপন একটা জরুরী জিনিস। আর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তো modelling থাকবেই। আমি modelling-এর পক্ষ নিয়েই কথা বলব। আমি নিজে এটাকে পেশা করতে চাই না – খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে। তাছাড়া মডেলিং করতে গেলে নিজের ওপর যথেষ্ট যত্ন নেবার দরকার। একটা modelling face maintain করা চাই তো। এখন অত সময় কোথায়? তবে যারা modelling-কে পেশা হিসেবে রাখতে চান, খুবই ভাল একটা পেশা।'

বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে মেয়েদের কী ধরনের ইমেজ থাকা দরকার, যা তাদের সম্মান রাখবে?

'হ্যাঁ, এখন যেটা খুব দেখা যাচ্ছে, সব ব্যাপারেই vulgarity দেখানো হচ্ছে। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনেই দেখছি মেয়েদের body expose করা হচ্ছে। এই জিনিসটা ভাল লাগে না। vulgarity avoid করতে না পারলে মডেলিং-এর কাজে মেয়েদের কোনো সম্মান থাকবে না।'

আমি দেখেছি যেসব বিজ্ঞাপনে মেয়েদের না রাখলেও চলে, যেমন ছেলেদের underwears-এর বিজ্ঞাপনে কিংবা ক্যামেরার বিজ্ঞাপনে বিকিনি পরা মেয়ে – এসব ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যাওয়া যায়।

'ঠিক তাই। এসব Vulgarity-কে avoid করতে পারলে মডেলিং ব্যাপারটা অনেক সুন্দর, অনেক interesting হতে পারবে।'

আপনি আরও মডেলিং করবেন নিশ্চয়?

'হ্যাঁ, নিশ্চয় করব। তবে, ওই তো বললাম, বড্ড সময় দিতে হয়।'

সুস্মিতা সিংহ



অরুন্ধতী মুখার্জি

এই বাংলার মুসলিম নারীসমাজ

নীনা আতাহার

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এপার বাংলার মুসলিম মেয়েরা ওপার বাংলার তুলনায় জীবন ও জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন এগিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের প্রায় চার দশক পরে সেই চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সামাজিক অনুশাসন, হতাশাব্যঞ্জক শিক্ষার হার, অনাগ্রহ ইত্যাদির প্রতিকূল স্রোত ঠেলে এপার বাংলার মুসলমান মেয়েরা আজ আর শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্য শিল্পসংস্কৃতির হৃত উজ্জ্বল আসনটি দখল করতে পারছেন না। তাঁদের অসফলতার মুখ্য কারণগুলি একটি স্পষ্ট চেহারা পেয়েছে বর্তমান প্রতিবেদনে।

কথাটা ইচ্ছে করেই লিখলাম কেননা এখন এই বাংলা আর ওই বাংলার মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি চেতনা এমনকি ভাবনার মধ্যেও ব্যবধান অনেক। অথচ আশ্চর্য এই, আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে পূর্ববাংলার মেয়েদের চেয়ে পশ্চিমবাংলার মুসলিম মেয়েরা ছিলেন সব দিক থেকেই উন্নত। কি অদ্ভুত ভ. াকা ঘুরে গেল। সূর্য চলে গেল ওপারে এপারে শুধুই অন্ধকার। ওপারে হাজার হাজার মুসলিম মেয়েরা যখন অফিসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সাহিত্যে স ্কৃতিতে খ্যাতিমান, সংগীত জগতে বিশ্বজোড়া নাম, ফিল্মের অভিনেত্রী প্রচুর, নৃত্যে সুনামের অধিকারিণী এব রাজনীতিতে প্রথম সারিতে—তখন এপার বাংলায় ? শূন্য, শুধু শূন্য!

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। আমরা টেলিভিসনে বেশ কয়েকবার অনুষ্ঠান করেছি ঈদ বা অন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ (শতকরা ৯০ ভাগ) হিন্দু ছেলেমেয়ে নিয়ে। প্রযোজক বললেন, দেখুন যেহেতু এই অনুষ্ঠান ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কথা ভেবেই করা হয় তাই মুসলিম মেয়ে কিছু থাকা দরকার। অতএব খোঁজা শুরু হলো পার্ক সার্কাস থেকে খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ থেকে তালতলা। হয়তো কলকাতার সব দেখা সম্ভব হয়নি কিংবা সর্বত্র যাওয়া হয়ে ওঠেনি কিন্তু বহু চেষ্টা করে একটিও বাঙালি মুসলিম গায়িকা পাওয়া যায়নি। সামশুল হুদা রোডে এক সঙ্গীত শিক্ষকের বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর একটি স্কুল আছে। বলেছিলেন, গত পনের বছরে একটিও মুসলিম মেয়ে পাইনি। একবার ঘোষণা করেছিলাম মুসলিম মেয়ে যদি গান শিখতে আসে তাহলে বিনা পয়সায় শেখাবো, তাও না।

এই ঘটনায় অনেক মুসলিম মেয়ে বা অভিভাবকেরা দুঃখ পাবেন কিন্তু এটা বড় সত্য। তবে এটা বলতে পারি, খোঁজ করলে বর্ধমানে, কৃষ্ণনগরে, সিউড়ি বা মেদিনীপুরে পাওয়া যেত। কলকাতার তুলনায় মফস্বলে বাঙালি মুসলিম মেয়েরা অনেক বেশি আগ্রহী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কলকাতায় যে সব অঞ্চলে মুসলমানরা বাস করেন, তার প্রায় সর্বত্রই অবাঙালিদের প্রাধান্য। এখানে মুসলমানেদের মধ্যে বাংলার চেয়ে উর্দু কালচারের প্রভাব অধিক। এমনকি বহু মুসলমান বাংলার চেয়ে উর্দু বলতে বেশি পছন্দ করেন। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই যখন দেখি বাবা মা দুজনেই বাঙালি অথচ ছেলেমেয়েরা উর্দু বলছে। এরা এক অদ্ভুত পরিবেশে মানুষ। উর্দু সাহিত্য সংস্কৃতি যথেষ্ট উন্নত অথচ এরা না পেরেছে সেদিকে যেতে না পেরেছে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে আগ্রহী হতে।



ডাক্তার সওকত আরা বেগম

বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ, সাহিত্য সংস্কৃতিতে আগ্রহী প্রচুর মুসলিম মেয়ে পাওয়া যাবে মফস্বল পশ্চিমবাংলায়। সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রেও মুসলিম মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক এগিয়েছে। অনেক মফস্বল শহরে কলেজ বা স্কুলের অনুষ্ঠানে এখন কিছু কিছু মুসলিম মেয়ে নজরে পড়ে। আবৃত্তি, গান এমন কি নাচেও অংশ নিচ্ছে, একটা কলেজে দেখেছিলাম ছাত্র রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এটা নজরে পড়ে না। এ কথা শুনতেও অবাক লাগে যেখানে মফস্বল শহর বা গ্রামের চেয়ে কলকাতা অনেক বেশি এগিয়ে আছে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতে, সেখানে মুসলিম মেয়েরা কলকাতার চেয়ে মফস্বল শহর গ্রামে বেশি এগিয়ে। এটা অ-মুসলিম প্রভাব। যার জন্য প্রথমে অবাঙালি মুসলিমদের কথা বলেছি। অবাঙালি মুসলিমরা গোঁড়া, ধর্মচর্চা তাঁদের অনেক বেশি। কলকাতার যে কোন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে জমজমাট ধর্মীয় জলসা হামেশা হয়। এবং এই সব অঞ্চলে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মুসলিমদের প্রভাব বেশি। দু একটি জায়গায় বাঙালি মুসলিমরা প্রথম সারিতে থাকলেও আশ্চর্যভাবে তাঁরা উর্দু সংস্কৃতির উপাসক হয়ে যান।

এবার এই বাংলার বাঙালি অবাঙালি মুসলিম মেয়েদের বর্তমান অবস্থাকে একটু গভীরে গিয়ে দেখা যাক। এই অবস্থাকে ছ'ভাগে ভাগ করা যায়।

১) পৃথিবীর তাবৎ দেশের মেয়েদের মতো এদের কাছেও ডেসটিনেশন হচ্ছে বিবাহ, একজন স্বামী। সেই গন্তব্যটাকে সামনে রেখে যা কিছু প্রয়োজন।
২) অন্য সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় শাসন অনেক বেশি।
৩) সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিতে হিন্দু মেয়েরা (বাঙালি মেয়েরা বোধ হয় এ ব্যাপারে ভারতে প্রথম সারিতে) যতটা আগ্রহী মুসলিম মেয়েরা তার তুলনায় কিছুই নয়।
৪) এখনো পর্দাপ্রথা (বুরখা নয়, অন্দরমুখী) বেশির ভাগ মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বর্তমান।
৫) শিক্ষার হার অনেক কম।
৬) মুসলিম সমাজে পুরুষরা অনুদার।

আজকাল শিক্ষিত মুসলমান ছেলেরা গ্র্যাজুয়েট মেয়ে না হলে বিয়ে করতে চায় না। এই কথা বহুবার বিভিন্ন জায়গায় শোনার পর বাবা মা মেয়েকে স্কুল পাশের পর কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। যেমন হিন্দু, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু পাত্র মাত্রই চান বউ একটু গানবাজনা জানলে ভাল হয়। তেমনি যখন মুসলমান পাত্ররা চাইতে শুরু করবেন তখন

দেখা যাবে মেয়েরাও শিখছেন। চান না কথাটা বলবনা কিন্তু পাত্র চাইলে তো হবে না—পাত্রের আব্বা, চাচা আর যদি নানা-নানি থাকে তাহলে তো কথাই নেই। সংগীত ইসলাম বিরোধী বলে ফতোয়া দেবেন। ছেলের তখন রেডিয়ো রেকর্ডার শুনেই মন ভরাতে হবে। বউয়ের গান চলবে না।

মুসলিমধর্ম যেহেতু অনেক পরে এসেছে তাই তার প্রভাব ও অনুশাসন সমাজের উপর অনেক বেশি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় শিখধর্ম তারও অনেক পরে এসেছে তাই শিখসমাজে ধর্মীয় প্রভাব আরো বেশি। দাড়ি রাখা, সুন্নত। হজরত মহম্মদের দাড়ি ছিল, অনেক মুসলমান তাই দাড়ি রাখেন। তেমনি লক্ষ লক্ষ মুসলমান রাখেনও না। তা নিয়ে কেউ কিছু ভাবেনও না। কিন্তু একজন শিখের দাড়ি বা পাগড়ি নেই এ দেখা যায় না। যাই হোক অন্য প্রাচীন ধর্মগুলোর চেয়ে ইসলামধর্মের প্রভাবটা বেশি। আর সেইজন্যে সে শাসন মানতেই হয়। তাই দেখা যায় কোরান শরীফ গড়গড় করে পড়ে যাচ্ছে একটা মেয়ে কিন্তু ইংরেজি কিছুই জানে না।

এই আগ্রহ কমের কারণ চাহিদা কম। এখনো সাহিত্যশিল্পের সামান্যতম চর্চা বহু মুসলিম বাড়ির ধারেকাছে নেই। পর্দাপ্রথা অনেক উঠে গেলেও গ্রামের দিকে প্রচুর। শিক্ষা আগের তুলনায় অনেক বাড়লেও এখনো তা যথেষ্ট নয়।

এইসব কারণে মুসলিম মেয়েরা এখনো অনেক পিছিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা এই পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ যেটা, তা হলো মুসলিম পুরুষদের অনুদার ও সন্দেহবাতিক মনোভাব। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের সময় মেয়েরা যুদ্ধ করেছে, নানা সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে গেছে। আজ চোদ্দশ বছর পরে মুসলিম পুরুষেরা যুদ্ধ কেন সাধারণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও বাড়ির মেয়েদের যেতে দেন না।



অধ্যাপিকা মনয়ারা খাতুন ফটো : অভিজিৎ রায়

আর একটা কথা এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, এ দেশে মুসলিম মেয়েদের গঠিত নিজস্ব কোন সংগঠন নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষে তাই মুসলিম মেয়েদের সুবিধের জন্যে বলার কেউ নেই। পার্লামেন্টে বা আরো উচ্চস্থানে শ্রীমতী মহসিনা কিদওয়াই বা বেগম আবিদা আহমেদ এবং আরো কেউ কেউ থাকলেও মুসলিম মেয়েদের হয়ে কে বলেন! তাই বিশ্বে বহু দেশে যখন একাধিক বিবাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গেল মুসলিমদের ভেতর, তখন ভারতবর্ষে তা বহাল তবিয়তে চলছে।

এইসব সমস্যা বাধাবিঘ্ন পেরিয়েও কিছু কিছু মুসলিম মেয়ে পাদপ্রদীপে এসেছেন। সংখ্যায় কম হলেও একেবারে শূন্য নয়, সেটাই আনন্দের কথা। যেমন বহুদিনের পুরনো চিকিৎসক পার্ক ভিউ নার্সিং হোমের ডাক্তার আনোয়ারা খাতুন, মুসলিম মেয়েদের জগতে অন্যতম নাম। আর একজন তরুণী ডাক্তারের কথাও মনে পড়ছে যিনি বর্তমানে ইসলামিয়া হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, ডাক্তার সওকত আরা বেগম। ইসলামী শিক্ষায়ও উনি যথেষ্ট পারদর্শিনী, আছেন ডাক্তার নাসিদাবানু, সামশুল হুদা রোডে থাকেন। আছেন আরো বহুজন। বিলেত ফেরত এবং বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তার মমতাজ বেগম একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। স্বামী ব্যারিস্টার। ডাক্তার মমতাজ বেগম আইনমন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লা সাহেবের একমাত্র কন্যা।

খিদিরপুর কলেজের অধ্যাপিকা মনোয়ারা খাতুন ছাড়াও আরো দু একজন অধ্যাপিকা আছেন, এবং দু চারজন কবি ও লেখিকা আছেন কিন্তু এই মুহূর্তে চিত্রশিল্পী (আঁকিয়ে) বা সংগীত শিল্পী বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ সংস্কৃতির দিকটা শূন্য বললেই হয় এবং সংস্কৃতি চেতনা না থাকলে শিক্ষা ঠিক ডালপালা বা ডানা মেলতে পারে না।

নজরুল ইসলামের একটা কবিতার অংশ মনে পড়ছে—

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

কিন্তু কজন পুরুষ জানেন সে কথা! অন্তর থেকে জানলেই তো মেয়েরা এগিয়ে যেতে পারে না। এগিয়ে যাওয়ার পথ সৃষ্টি করে দিতে হবে পুরুষদেরই, কেননা পুরুষশাসিত সমাজে সেটিই প্রয়োজন। বাবা, ভাই বা স্বামী উদার হলে এবং প্রেরণা যোগালেই মেয়েরা এগোতে পারে। যে জাতি, যে ধর্মাবলম্বী বা যে সমাজের মধ্যে সেটি বেশি, ততই সে সমাজ এগিয়ে। মুসলিম মেয়েরা সে পরিবেশ পেলেই, সে সুযোগ পেলেই আরো এগিয়ে যেতে পারবেন সন্দেহ নেই।



একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেকা তরুণী কর্মী ফটো : দীপক সেন

রান্না

খিদের মুখে ভারী জলখাবার

দুপরে ভাত-ডাল-মাছ এবং রাত্রে রুটি অথবা ভাত, তরকারি-মাছ-দুধ – এই হল বেশিরভাগ বাঙালির প্রতিদিনকার লাঞ্চ ও ডিনারের মেনু। এর পরিবর্তন বড় একটা হয় না। কাজেই দুপুর ও রাতে খাওয়ার জন্য গৃহিণীকে ততটা চিন্তা করতে হয় না, যতটা করতে হয় সকাল-বিকেলের জলখাবারের জন্য। প্রত্যেকদিন একই জলখাবার কারো মুখেই রোচে না। অথচ খিদের সময় পেট ভরা দরকার এবং একইসঙ্গে মুখরোচক খাবার না পেলে মেজাজটা ঠিক রাখাও শক্ত। আজ সকালে অথবা বিকেলে স্বামী-পুত্র-কন্যাদের কী জলখাবার দেব এটা গৃহিণীদের প্রায় নিত্যদিনের সমস্যা। এছাড়া বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় তো লেগেই আছে। আজ আমি কয়েকটি বিশেষ ধরনের জলখাবারের কথা বলব যা তৈরি করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু মুখরোচক।

মাটন হট ডগ

উপকরণঃ ৬জন লোকের জন্য করলে লাগবে ৫০০ গ্রাম মাংসের কিমা, মাঝারি সাইজের ৪টি পেঁয়াজ, বড় একটুকরো আদা, ৮/১০ কোয়া রসুন, ২টি তেজপাতা, খানিকটা গরম মশলা, ৬টি লম্বা আকৃতির বনরুটি, ৫০ গ্রাম মাখন, আধকাপ তেল, আন্দাজমত হলুদ ও নুন, ২ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো।

প্রণালীঃ প্রথমে মাংসের কিমা ভাল করে ধুয়ে শিল-নোড়ায় যতটা সম্ভব মিহি করে বেটে নিন। এরপর কিমাটাকে খানিকটা ভিনিগারের মধ্যে মিনিট দশেক ভিজিয়ে রাখুন। পেঁয়াজ, আদা, রসুন ভাল করে বেটে নিন। কড়াইতে তেল দিন। তেল গরম হলে তেজপাতা দিন এবং গরম মশলা থেঁতো করে তেলের মধ্যে দিন। ভাজা গরম মশলার গন্ধ বেরিয়ে গেলে লঙ্কা ও বাটা মশলা ছেড়ে দিন। মশলা ভাজা হয়ে গেলে মাংসের কিমা ছেড়ে দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। বেশ খানিকক্ষণ পর অল্প নুন আর পরিমাণমত জল দিন মাংস সেদ্ধ হওয়ার জন্য। সেদ্ধ হয়ে গেলে আবার খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করুন যাতে জল একটুও না থাকে। মাংসের কিমা একেবারে শুকনো হবে।



মাটন হট ডগ



মুন-ব্রেড ডিলাইট

এবার বনরুটিগুলো মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলুন। রুটিগুলোর ওপরে ও ভেতরে অল্প মাখন মাখিয়ে ওভেনে একটু বেক করুন। বেকিং ওভেন না থাকলে উনুনে অথবা গ্যাসে টোস্ট করে নিন। শেষে মাংসের কিমা একটি রুটির মাঝখানে দিয়ে আর-একটি রুটি দিয়ে চেপে দিন। ডিশের চারধার গোল করে কাটা শশা, পেঁয়াজ, বিট, গাজর ও টম্যাটো দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

প্রন-ব্রেড ডিলাইট

উপকরণঃ ৬ জনের মত করলে লাগবে ৫০০ গ্রাম চিংড়িমাছ, ৮ স্লাইস পাউরুটি, অর্ধেক নারকেল, ১টি তেজপাতা, ৪ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ২ চা-চামচ ধনেগুঁড়ো, ৬-কোয়া রসুন, ২ ইঞ্চি লম্বা আদা, আধ চা-চামচ গরম মশলা, আধকাপ বনস্পতি বা ঘি, আধকাপ তেল এবং পরিমাণমত নুন ও হলুদ।

প্রণালীঃ প্রথমে চিংড়িমাছ ভাল করে কেটে, বেছে ধুয়ে নিন। আদা ও রসুন ভাল করে বেটে নিন। নারকেল কুরিয়ে লঙ্কা ও ধনেগুঁড়োর সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। রুটিগুলোকে ছোট ছোট টুকরো (আড়াই সেন্টিমিটার) করে কেটে নিন।

কড়াইতে ঘি বা বনস্পতি দিয়ে পাউরুটির টুকরো বাদামী রঙ করে ভেজে নিন। এবার অন্য একটি কড়াইতে তেল দিয়ে প্রথমে তেজপাতা দিন। এরপর আদা-রসুন বাটা দিন। অল্প ভাজা হলে চিংড়িমাছ ছেড়ে দিন। ৭ মিনিট মত ভাজুন। এরপর নারকেলের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। খানিকটা ভাজা হয়ে গেলে আধকাপ জলে আন্দাজমত নুন গুলে কড়াইতে ঢেলে দিন। চিংড়িমাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাজা পাউরুটি দিয়ে দিন এবং নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না জল শুকিয়ে যায়। নামানোর আগে গরম মশলা দিয়ে দিন।

একটা সুন্দর ডিশে ঢেলে দিন ও পরিবেশন করার আগে ডিশের চারপাশে আলুভাজা, গোল করে কাটা পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে সাজিয়ে দিন।

চিংড়িমাছ সবসময় বাড়িতে থাকে না। আপনি চিংড়িমাছের বদলে ফুলকপি দিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে স্বাদ অন্যরকম হয়ে যাবে।

বার-বী-কিউ সস

উপকরণঃ ২৪টি বড়মাপের টম্যাটো, ৪৫০ গ্রাম কুচোনো সেলারি (celery), ৪৫০ গ্রাম কুচোনো পেঁয়াজ, ৩টি মাঝারি মাপের ক্যাপসিকাম, ২/৩ টি লাল লঙ্কা, ২৫০ গ্রাম বাদামী চিনি, ২ কোয়া থেঁতো রসুন, ২ চা-চামচ সরষে, ২ চা-চামচ নুন, ১ চা-চামচ শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো, ১ কাপ ভিনিগার ও ১ চা-চামচ সস।

প্রণালীঃ টম্যাটো, পেঁয়াজ, সেলারি পাতা, ক্যাপসিকাম ও লঙ্কা একসঙ্গে সেদ্ধ করুন যতক্ষণ না নরম হয়। মোটামুটি ৩০ মিনিটের মত সময় লাগবে। এরপর ভাল করে চটকে একটা সূক্ষ্ম ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে আবার ফোটাতে থাকুন। ফোটাবার পর মিশ্রণটি যখন মোটামুটি অর্ধেক হয়ে যাবে তখন লাল লঙ্কাগুলো একটা পাতলা ন্যাকড়ার মধ্যে বেঁধে অন্যান্য মশলার সঙ্গে মিশ্রণটির মধ্যে ছেড়ে দিন এবং আস্তে আস্তে একভাবে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না মিশ্রণটি কেচাপ-এর মত ঘন, থকথকে না হয়। মোটামুটি দেড় ঘন্টার মত সময় লাগবে। এবার ঠান্ডা হতে দিন।

সংরক্ষণের উপায়ঃ অল্প জলে চা-চামচের চারভাগের তিনভাগ সোডিয়াম বেনজোনেট (Sodium Benzonate) মিশিয়ে নিন। প্রতি এক কিলো সসে ওই পরিমাণ মেশাবেন। বোতলে ভরে ফেলুন এবং এক চিমটে বেনজোনেট প্রত্যেক বোতলের উপরে ছড়িয়ে দিন। যে বোতলে ভরবেন সেটা যেন সম্পূর্ণ শুকনো থাকে। সারাবছর ধরে পাউরুটি, অমলেট, চপ, কাটলেট – যার সঙ্গে খুশি খান।

টম্যাটো মহাশা

উপকরণঃ ৫০০ গ্রাম পাকা ও তাজা টম্যাটো, ১০০ গ্রাম পেঁয়াজ, ২২৫ গ্রাম ডাল, ২২৫ গ্রাম আলু, ২টি কাঁচা লঙ্কা, ৫০ গ্রাম তেল, অল্প ময়দা ও পরিমাণমত নুন।

প্রণালীঃ প্রথমে টম্যাটোর মুখটা কেটে ভিতরের বীজগুলো ফেলে ভাল করে ধুয়ে নিন। অল্প নুন দিয়ে টম্যাটোগুলোকে মেখে আলাদা-আলাদা ভাবে তাকের উপর রেখে দিন। ডাল, আলু, লঙ্কা সেদ্ধ করার পর মিহি করে চটকে নিন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন।

এবার কড়াইতে তেল দিয়ে কুচোনো পেঁয়াজ ভেজে নিন। ডাল, আলু ও লঙ্কা-মাখাকে ওই পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে ভালভাবে নাড়ুন। অল্প ভাজা হলে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। এরপর পুরটা পরিমাণমত এক-একটা টম্যাটোতে ভরতি করে টম্যাটোর মুখটা ময়দার লেই দিয়ে বন্ধ করে দিন।

কড়াইতে তেল গরম করে টম্যাটো ভাজতে আরম্ভ করুন। প্রথমে যে-দিকটা ময়দার লেই দিয়ে বন্ধ করেছিলেন সে-দিকটা আগে ভাজবেন। বাদামী রঙ হলে উল্টে দিন এবং সবদিকটাই ভালভাবে ভাজুন, দেখবেন টম্যাটো যেন বেশ নরম হয়। কড়াই থেকে নামিয়ে ডিশে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ঝুনু লাহিড়ী

ফটো : অচিন্ত্য হাজরা

হাস্যকৌতুক

ডাইনিং টেবিলে নববিবাহিত দম্পতি –

স্বামী। ডালটা একেবারে আলুনি। এটা নিশ্চয় তোমার রান্না নয়।

স্ত্রী। না, না, ওটা তো মধুর মা জোর করে নিজেই রাঁধল। আমি রেঁধেছি মাংস।

স্বামী। তা কই মাংসটা দাও।

স্ত্রী। সেটা নুনে পোড়া হয়ে গেছে, তাই টমিকে দিয়ে দিয়েছি।

* * * *

স্ত্রী। শুনছ ! আর কিন্তু আমায় বেহিসেবী বলতে পারবে না। আমি গত দুমাস টি ভি-র ইনস্টলমেণ্ট দিইনি। এ মাসে ফ্রিজের ইনস্টলমেণ্টটা চেপে যাব। আর সামনের মাসে সেলাই মেশিনের ইনস্টলমেণ্ট দেব না ঠিক করে রেখেছি। তাই আজ ইনস্টলমেণ্টে একটা দারুণ সুন্দর সোফা কিনে নিয়েছি।

* * *

উকিল। যাক ! আপনাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই যাতে ভাল হয় এমন একটা ব্যবস্থা আমি শিগগির করে ফেলছি।

স্ত্রী। সে কি ? দুজনের একসঙ্গে ভাল ? সে তো আমি নিজেই করতে পারতাম। তাহলে আপনার মতন উকিলকে এত টাকা দিচ্ছি কেন ?

* * * *

১৮ বছর ধরে একজন মহিলা বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় একটি ছেলেকে স্বাধীন সাবালক গড়ে তোলেন। ইনি মা।

১৮ দিনের মধ্যে আর একজন মহিলা সেই ছেলেটিকে পরাধীন নাবালক বানিয়ে নেন। ইনি পত্নী।

কুরুশে বোনা স্কার্ফ ও কাঁটায় বোনা টি শার্ট

ঋতুপর্যায়ে কয়েকদিনের অতিথি শীত এবারে একটু বড় করে আসর বসালেও এখন চলে যাবার মুখে। তার অভ্যর্থনা, বিদায়—সবকিছুর জন্যই কিছু বোনাবুনির আয়োজন হল। অবশ্য নিজেদের জন্য বা বাড়ির কোনো বয়স্কার জন্য কিছু করা হয়ে ওঠেনি। কারণ এই অল্পদিনের মধ্যে এতকিছু তো হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, গরম জামার কথাই বলছি। তাই এখন একটি কুরুশে বোনা স্কার্ফ-এর কথা বলছি। এটি হয়ত এর মধ্যে তৈরি করতে পারবেন না, তবুও শুরু করে দিতে পারেন। অবসর মত শেষ করা যেতে পারে। তাহলে এর জন্য আলাদা করে সময় দিতে হয় না এবং অন্যের জন্যও সময় রাখা যায়। এই সঙ্গে বাচ্চাদের একটি টি শার্টের ডিজাইনও দেওয়া হল। এটিও শুরু করতে পারেন। অনেকদিন বোনাবুনির পর ঝপ করে শেষ করলে কেমন যেন খালি খালি লাগে। তাই একটু একটু করে বুনে রাখলে আগামী শীতের শুরুতেই ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এখুনি বোনা আরম্ভ না করলেও আপনার সংগ্রহে রেখে দিতে পারেন।

কুরুশে বোনা স্কার্ফ

প্রথমে কুরুশের চাদরের কথা বলি। এটি বোনার সুবিধে হল, এর কয়েকটি টুকরো পরপর জুড়ে নিলেই চাদর হয়ে যাবে। টুকরোগুলি হবে চৌকো। টুকরোগুলিকে পাশাপাশি বা উপর-নিচ যেভাবে ইচ্ছে পরপর জুড়ে নিতে পারেন। কারণ এর চারদিকই একই রকম। আর জোড়া হবে ছুঁচ দিয়েই। এক-একটি টুকরো বুনতে দেড়খানার একটু বেশি উলের গোলার দরকার হবে। সাধারণ চাদরের মাপে চাদর করলে লম্বায় পরপর ৫টি টুকরো জোড়া হবে এবং চওড়ার দিকে ৩টি টুকরো দরকার। অর্থাৎ লম্বায় ৫টি করে যে সারি হবে—এই রকম তিন সারি হলেই মাপ ঠিক হবে। তবে এর চেয়ে ছোট বা বড় করা আপনার ইচ্ছে, আর সে উপায়ও থাকছেই।

সঙ্কেত ট্রে :—ট্রেবল, চে :—চেন, স্লি স্টি :—স্লিপ স্টিচ।

১ম লাইন—৯নং কুরুশ দিয়ে ৫টি চেন বুনুন ও ১ম চেনে কুরুশ ঢুকিয়ে উল জড়িয়ে নিয়ে একেবারে একসঙ্গে কুরুশের ফাঁসটির ভেতর দিয়ে একটিই ফাঁস টেনে নিন। একেই বলা হয় স্লিপ স্টিচ। এইভাবে জুড়ে নিতে হয়। যেমন এখানে জুড়ে নেওয়ার ফলে একটি বৃত্ত তৈরি হবে।

২য় লাইন—এবারে ৩ চে বৃত্তের ভেতর দিয়ে ১ ট্রে :, ৪ চে বৃত্তের ভেতর দিয়ে ৩ ট্রে :, ৪ চে বৃত্তের ভেতর দিয়ে ৩ ট্রে :, ৪ চে বৃত্তের ভেতর দিয়ে ৩ ট্রে :, ৪ চে বৃত্তের ভেতর দিয়ে ১ ট্রে :, প্রথমে বোনা ৩ চে :-এর প্রথম চে :-এর ভিতর ১ স্লি স্টি :, প্রথম ট্রে :-এর ভেতর ১ স্লি স্টি :, ৪ চে :-এর প্রথম চে :-এ ১ স্লি স্টি। এবারেও জুড়ে গেল।

৩য় লাইন—৩ চে :, আগের লাইনের ৪ চে :-এর প্রথমটিতে স্লি স্টি বোনা হয়েছিল—এবারে দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে *৪ চে :, দুই চেনের ভেতর ২ ট্রে ৩ ট্রে :-র ওপর ৩ ট্রে ওপরের ৪ চেনের প্রথম দুই চেনে ২ ট্রে (মোট ৭ ট্রে :)*। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকু আরও দুবার, ৪ চে ৫ ট্রে আগের লাইনের ৩ চে :-এর প্রথম চেনে ১ স্লি স্টি ট্রেবল-এ ১ স্লি স্টি প্রথম চেনে ১ স্লি স্টি দিয়ে জুড়ে নেওয়া

৪র্থ লাইন—৩ চে ১ ট্রে দ্বিতীয় চেনে আগের মতই. ৪ চে ৫ ট্রে (চেনের ভেতর দিয়ে প্রথমে ২ টি ট্রে বাড়িয়ে) পরের ট্রে :-এর ভেতর ৫ ট্রে বুনে শেষ ফাঁসটি বাড়িয়ে কুরুশ থেকে খুলে দিন। এবারে এই ৫ ট্রে :-র প্রথম ট্রে :-র ওপর দিয়ে কুরুশ ঢুকিয়ে খুলে-রাখা ফাঁসটি টেনে নিন। এতে ছোট একটি মুঠির মত তৈরি হবে। আবার ৫ ট্রে (পরের চেনে ২ ট্রে বাড়িয়ে) এভাবে প্রত্যেকবার আগে পরে ২টি করে বাড়িয়ে আরও ৩ বার ও শেষের বারে শেষ দুটি ট্রে :-এর পরিবর্তে আগের চেনের সঙ্গে ও ট্রে :-এর সঙ্গে জুড়ে দিন। এই জুড়ে দেওয়ার ফলে প্রত্যেক বার ২টি করে ট্রে হয়ে যাবে।

৫ম লাইন—৩ চে ১ ট্রে দ্বিতীয় চেনে, *৪ চে :, ৫ ট্রে :, ১টি মুঠি, ৩ ট্রে ১টি মুঠি ৫ ট্রে :*। তারকা-চিহ্নিত অংশের মত আরও ৩ বার, শেষটুকু ৪র্থ লাইনের মত। প্রত্যেক বারেই শেষটুকু একই রকম।

৬ষ্ঠ লাইন—৩ চে দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে :, *৪ চে ৯ ট্রে :, ১ মুঠি, ৯ ট্রে :*। তারকা-চিহ্নিত অংশ আরও ৩ বার। শেষে জুড়ে নেওয়া। জোড়াটা কিন্তু ৩ বার স্লি স্টি দিয়ে।

৭ম লাইন—৩ চে দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে :, *৪ চে :, ২৩ ট্রে :*। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকু আরও ৩ বার।

৮ম লাইন—৩ চে :, দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে :, *৪ চে : ২৭ ট্রে *। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকু আরও ৩ বার।

৯ম লাইন—৩ চে দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে :, *৪ চে :, ৭ ট্রে :, (১ মুঠি, ৩ ট্রে ৫ বার) ৭ ট্রে :*। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকু আরও ৩ বার। তাহলে মাঝখানে ৫টি মুঠি পড়বে।

১০ম লাইন—৩ চে দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে *৪ চে ৭ ট্রে ১ মুঠি (২ চে :, ১টি করে ট্রে : ছেড়ে ১ ট্রে :, এভাবে ৯ বার), ২ চে ১টি ট্রে ছেড়ে ১ মুঠি, ৭ ট্রে :*। তারকা-চিহ্নিত অংশটুকু আরও ৩ বার। তাহলে মাঝখানে ৯ টি ট্রেবল ও দুপাশে চেনের ঘর পড়বে, আর এগুলির প্রথমে ও শেষে ১টি করে মুঠি পড়বে।

১১শ লাইন—৩ চে :, দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে :, *৪ চে :, দ্বিতীয় চেনে ১ ট্রে :, *৪ চে :, ১ মুঠি, ২ চে আগের লাইনের মুঠির মাথায় ১ ট্রে ২ চে (আগের লাইনের ট্রে :-এর মাথায় ১ ট্রে :, এভাবে ৯ বার), ২ চে :, আগের লাইনের মুঠির মাথায় ১ ট্রে :, ২ চে :, পরের ট্রে :-এর মাথায় ১ মুঠি, ৭ ট্রে। এভাবে তারকা-চিহ্নিত অংশটুকু আরও ৩ বার।

এইরকম ভাবে দুপাশের মুঠির মাথায় ১ টি করে ট্রেবল বাড়িয়ে ও তার দুপাশে ১টি করে মুঠি দুধারেই বাড়িয়ে আরও ৫ লাইন বুনে যেতে হবে। আর প্রত্যেক ভাগেরই দুধারে ৭টি করে ট্রেবল বোনা হবে শেষে জোড়াও হবে একই রকম ভাবে। ১৬ লাইনে শেষ করে দিতে হবে এই লাইনের মাঝখানে ১৯ টি ট্রেবল হবে আর তার দুধারের ফাঁকা চেনের ঘর হবে ২০ টি। এই লাইনে শেষে



কাঁটায় বোনা টি শার্ট

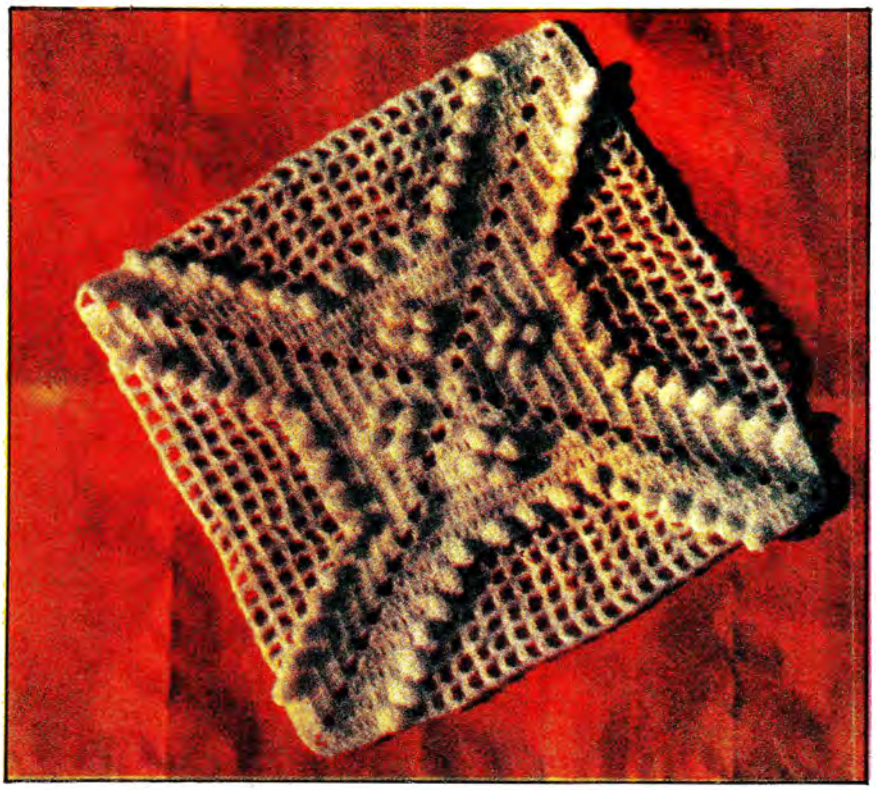
জোড়ার পর কুরুশের ফাঁসের ভেতর দিয়ে উল ছিঁড়ে টেনে নিয়ে ঘর বন্ধ করে দিন। এখন দেখুন কেমন চৌকো একটি টুকরো তৈরি হয়ে গেল। এই রকম ১৫টি টুকরো হলে একটি সুন্দর চাদর তৈরি হয়ে যাবে। অবশ্য এটি একটু ব্যয়সাপেক্ষ হলেও এতই সুন্দর হয় যে, খরচের কথা মনেও হয় না, আর তা হয়ও সত্যিই কাজের। আপনি অবশ্য এরকম করে সুতো দিয়ে বুনে বিছানার বেডকভারও করে ফেলতে পারেন বিশেষ বিশেষ দিনে তা ব্যবহার করলে আপনার কাজেরও সার্থকতা আসবে এবং গৃহস্থালীকে দেবে এক অনুপম রূপ।

কাঁটায় বোনা টি শার্ট

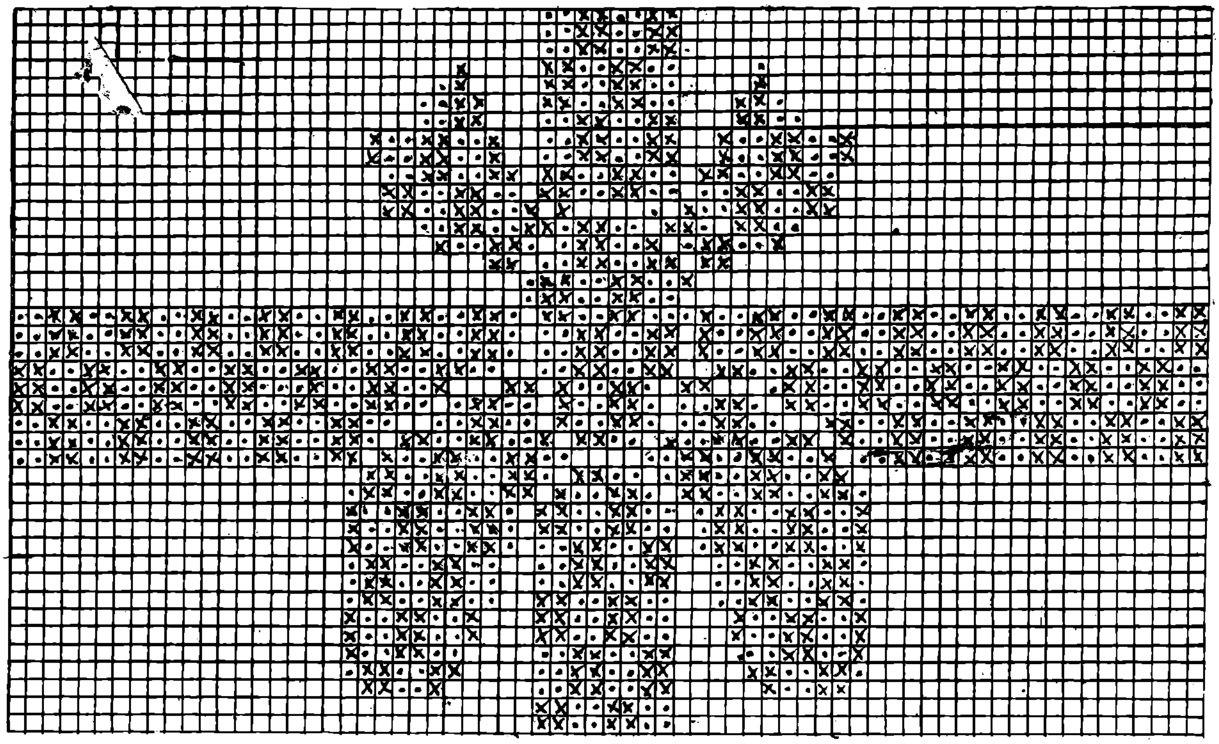
এরপর কাঁটায় বোনা টি শার্টটির কথায় আসা যাক। এটি বোনা কিছুই নয়। যেমন বোনা হয়—এক্ষেত্রেও তাই হবে। শুধু আপনার কাজ হল সঙ্গে দেওয়া গ্রাফ দেখে বুকের ঠিক মাঝখানটি থেকে ডিজাইন শুরু করা। এখানে ডিজাইনটির শুরুতে ৮ ঘর দরকার। তাই বুকে যত ঘর আপনি নেবেন, তা থেকে ৮ বাদ দিয়ে যা থাকবে তাকে দু ভাগে ভাগ করে নেবেন। তাহলেই ঠিক মাঝামাঝি ডিজাইন উঠবে। হাতেও ঠিক মাঝখানে একটু ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। এই ডিজাইনটিই কাঁধ বরাবর চলে গেছে। এর জন্য যা করতে হবে তা হল—হাতের খন্ডে বগলের ঘর ফেলে দেওয়ার পর যা ঘর থাকবে তাকে বুনে যেতে হবে কাঁধের মাপ মত। অর্থাৎ কাঁধ যতখানি চওড়া হবে, এই অংশটুকু ততটা লম্বা [illegible]। এই অংশটুকু পরে বুকের ও পিঠের অংশের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। তাই বুক ও পিঠের গলা বোনার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে।

এই বাড়তি অংশটুকুকে দু ভাঁজ করলে এক-এক ভাঁজে যতটা হবে—বুকের ও পিঠের গলার কাট সাধারণ ভাবে যতটা গভীর করা হয় তার চেয়ে ঠিক ওইটুকু কম গভীর হবে কারণ সেলাই করার পর গলার দিকে ওইটুকু বেড়ে যাবে। আর এখানে গলায় খুব ছোট কলার করা

কুরুশে বোনা স্কার্ফ-এর একটি অংশ



ফটো: শংকর নারায়ণ দাস



টি শার্টের গ্রাফ

হয়েছে, সামনে কাটাও করা হয়েছে সামান্য। আপনি ইচ্ছে করলে গোল গলা ও মাথা গলানোও করতে পারেন। তাও দেখতে খুবই সুন্দর হবে। এইরকম টি শার্টে পেছনে কিছু দেওয়ার দরকার নেই।

যাই হোক অনেক বোনাবুনি হল। এবারে আমরা উলের ঝাঁপি বন্ধ করে দিলাম। আগামী সংখ্যায় আর উল বোনাবুনি নয়, অন্য সেলাই নিয়ে বসব।

পুতুল খান্না

মাঝের মানুষ

প্রিতম মুখোপাধ্যায়



এইমাত্র খবরটা পেল সুব্রত। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে স্বয়ং পার্সোনাল ম্যানেজার ফোনে জানালেন যে সেই তিনজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। খবরটা জানিয়েই উনি ফোন রেখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাছ থেকে একটা ঠান্ডা স্রোত সরীসৃপের মত সুব্রতর শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল। দ্রুত একটা সিগারেট ধরাল। হাতটা কাঁপছে। ব্যাপারটা ভুলে যাবার জন্য কাজে মন দেবার চেষ্টা করল। টেবিলে পড়ে থাকা কাগজের হেডলাইনগুলো আবার পড়ল। কোন কিছুতেই মন বসছে না। পি· এম অত তাড়াতাড়ি ফোনটা ছেড়ে দিলেন কেন ? আর একটু সময় পেলে দু-একটা খুঁটিনাটি জেনে নিতে পারত সুব্রত। অন্তত এটুকু যে, ইতিমধ্যে এই বরখাস্তের খবরটা কতদূর চাউর হয়েছে।

দরজা খুলে চেম্বারের বাইরে এল। লম্বা অফিসঘর। পরপর ষাট সত্তরটা টেবিল। প্রায় সকলেই কর্মব্যস্ত। টাইপ রাইটারের শব্দ, টুকরো কথাবার্তা, চাপা হাসি। সবই স্বাভাবিক। কোনো উত্তেজনা নেই। একইরকম ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল খাস-বেয়ারা। বেয়ারাকে জল দিতে বলে টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল সুব্রত। যাবার পথে দু-একজনের কাজ সম্পর্কে খোঁজ নিল। অন্যদিনের থেকে একটু বেশিই আগ্রহ দেখাল সে। অবসরমুখী এক বৃদ্ধ ক্লার্ককে বলল, কি শরীর কেমন বা নতুন চাকরি পাওয়া ছেলেটিকে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, স্কোর কত—গাভাসকারের ফিফ্‌টি হল ?

প্রায় একবছর হল হেড অফিসের ইনসপেকশন ডিপার্টমেন্টে চীফ অফিসার হয়ে এসেছে সুব্রত নিয়োগী। আগে ছিল ব্রাঞ্চ অফিসে। ওই বিশ্রী ঘটনাটার পর তড়িঘড়ি বদলি করে সুব্রতকে এখানে আনা হয়। দশ বছরের কর্মজীবনে এইটাই ছিল প্রথম অঘটন। এর আগে পর্যন্ত নিস্তরঙ্গ এই কর্মজীবন কখনোই তার খারাপ লাগেনি। বরং বেশ ভালই লাগত বলা

যায়। আর তাই অফিসের বাইরেটা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সংসারকর্মেও সুব্রতকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না। এমনকি একমাত্র পুত্র জুন্টার স্কুল অ্যাডমিশনের ঝক্কিটুকু ওর চৌকস স্ত্রী নবনীতা একাই সামাল দিয়েছে।

সুব্রত হল কম কথা আর বেশি কাজের মানুষ। সুন্দর মুখ এবং ফর্সা, লম্বা চেহারাসমেত ব্যক্তিত্বময় এই সুব্রতর জীবনে তরতর করে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তাটি সবসময়ই ছিল কুসুমাস্তীর্ণ। বলতে গেলে ব্রাঞ্চ অফিসের সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটি তার প্রাপ্তবয়স্ক চলার পথে প্রথম বিপর্যয়। স্বাভাবিকভাবেই এরপর প্রায় বেশ কিছুদিন সে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। রাতের বিছানায় প্রত্যেকটা আগামীকালই তার কাছে অর্থহীন মনে হত। ঘুম আসত না। এমনকি আত্মহত্যার তীব্র ইচ্ছা পর্যন্ত তাকে ঘিরে ধরেছিল ক্রমশ।

সম্পূর্ণ ফাঁকা টয়লেট। এদিকটা ফাঁকাই থাকে। সাবস্টাফ ক্লার্কদের জায়গাটা ওদিকে। প্রথম প্রথম সুব্রত ওদিকেই যেত। কাজ আদায় করার জন্য এই ব্যাপারগুলো বেশ সাহায্য করে। পেচ্ছাপ পায়খানার আবার শ্রেণীবিভাগ হয় কী করে! কিন্তু পরে সুব্রত বুঝেছিল যে তাও হয়। একদিন ওই জনতা-টয়লেটের দরজা খুলেই সে শুনেছিল দুই কর্মচারীর বন্ধুত্বপূর্ণ খিস্তি বিনিময়। ওকে দেখেই চুপ করে গিয়েছিল তারা। অপ্রস্তুত সুব্রত তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল টয়লেট থেকে। আর সেইসময় পেছনের সহসা নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় খ্যাকখ্যাকে দ্বৈতহাসিতে। এরপর সুব্রত আর কখনো ওমুখো হয়নি।

জলের টুপটুপ ছন্দপতন। নিজেকে দেখছিল সুব্রত। চোখদুটো একটু বেশি লাল। প্রেসারের আধিক্য হয়তো। মুখে জলের ঝাপটা দিল। আয়নার কাছে ঝুঁকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল নিজেকে। ডিপার্টমেন্টের পরিচিত শব্দগুলোয় কান পাতল। অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। না, আশঙ্কার কোন কারণ নেই। অর্থাৎ ওরা কেউই এখনো জানে না যে, তিনজন কর্মচারীকে অবশেষে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইউনিয়নের কাছে নিশ্চয়ই খবরটা পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। যত গোপনীয়ই হোক সব খবরই অদৃশ্য ছিদ্রপথে ওদের কাছে চলে যায়। নইলে এনকোয়ারি কমিশনের কাছে সে যা যা বলেছে ইউনিয়ন সেক্রেটারি জয়ন্ত বিশ্বাস তার বক্তৃতায় সেই সমস্ত হুবহু কোট করল কী করে?

আসলে, এনকোয়ারি কমিশনের সামনে সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটিকে কিছুটা তরল করতে চেষ্টা করেছিল সুব্রত। ঘটনার ছ'মাস পরে কমিশনের কাজ শুরু হয়। ততদিনে সেই কালো ১৬ ডিসেম্বর অনেকাংশেই অতীত হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। কিন্তু জাঁদরেল এনকোয়ারি অফিসার মিঃ গুপ্তা সেই অতীতটাকে খুঁচিয়ে তুলে সুব্রতর আপাত-নিরপেক্ষ অবস্থানটিকে তছনছ করে দিয়েছিল।

—ওরা কেন আপনাকে ঘেরাও করেছিল?

—কারণটা খুবই সামান্য। একজন ক্লার্ক-এর ট্রান্সফার অর্ডার হয়েছিল। হেড অফিসের অর্ডার ছিল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ওকে রিলিজ করে দিতে হবে। ইউনিয়ন বলল, এই অর্ডারটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নিয়ম মেনে করা হয়নি। কাজেই এটা উইথড্র করতে হবে। ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, আপনি কনসার্নড ক্লার্ককে রিলিজ করতে পারবেন না।

—ভেরি গুড। তারপর আপনি কী করলেন?

—আমি পার্সোনাল ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। পি· এম বললেন, ওদের কোনো কথা শোনার দরকার নেই। ইমিডিয়েট অর্ডার ক্যারিআউট করুন।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। পি· এম কি বললেন, না ওদের কোনো কথা শোনার দরকার নেই। তাই তো? আর ইউ সিওর যে পি· এম এই কথাগুলিই বলেছিলেন? ওদের মিনস্ ইউনিয়ন, তাই তো?

—না, মানে ঠিক তা নয়। আসলে ওঁনার কথার ইমপ্লিকেশন এইরকম ছিল বলে আমার মনে হয়েছিল।

—মনে হয়েছিল? মিঃ নিয়োগী, এসামশনের ওপর বেস করে কোন স্টেটমেন্ট করবেন না। বি স্পেসিফিক। ও· কে, লিভ ইট। তারপর কী হল?

—তার পরের দিন মানে সিক্সটিনথ ডিসেম্বর সকালে এসেই আমি রিলিজ অর্ডার টাইপ করালাম। খবরটা সাম হাউ কনসার্নড এমপ্লয়ীর কাছে চলে যায়।

—সাম হাউ মানে? নিশ্চয়ই এটা আপনার স্টেনোগ্রাফারের কাজ। বি স্পেসিফিক। আই ওয়ান্ট পিন পয়েন্ট স্টেটমেন্ট। নেক্সট।

—ওই এমপ্লয়ী সেদিন অফিসে জয়েন করেছিল। রিলিজ অর্ডার তৈরি হচ্ছে শুনে সে সই কেটে দেয় এবং অফিস লিভ করে।

—ইটস্ আ সিরিয়াস অফেন্স। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সার্ভিস এগ্রিমেন্টের সেকশন টুয়েলভ অনুযায়ী ইট্স পানিশেবল। ইনক্রিমেন্টও বন্ধ হতে পারে। ওয়েল, তারপর আপনি কী করলেন?

—আমি ওঁর বাড়ির অ্যাড্রেসে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম।

—অবভিয়াসলি বাই রেজিস্টার্ড পোস্ট উইথ এ· ডি?

—ইয়েস স্যার। এবং অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার থেকে ওঁর নাম স্ট্রাইক অফ করে নোট দিলাম, ট্রান্সফার টু জোন থ্রি অ্যাজ পার এইচ ও অর্ডার নাম্বার সাচ এন্ড সাচ।

—ভেরি গুড। নেক্সট।

—খাতায় নাম কাটার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য এমপ্লয়ীরা কাজ বন্ধ করে দিল। ওরা ডিমান্ড করল যে, কনসার্নড ক্লার্ক-এর নাম রেজিষ্টারে না ওঠা পর্যন্ত দে উইল সীজ ওয়ার্ক।

—ওরা মানে, ইউনিয়ন পিপল্ অর এমপ্লয়ীজ?

—এমপ্লয়ীজ স্যার।

—অল অফ দেম অর এ সেকশান?

—এ সেকশান স্যার। মেমবারস অফ এ পার্টিকুলার ইউনিয়ন।

—দ্যাটস্ রাইট। মিঃ নিয়োগী এগেন আই রিকোয়েস্ট ইউ টু বি স্পেসিফিক। থ্যাঙ্ক ইউ।

দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল সুব্রত। চীফ ইঞ্জিনিয়র মিঃ রণবীর সেনগুপ্ত। লোকটার সঙ্গে কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। টাওয়েলে মুখ মোছার নকল ব্যস্ততা দেখাল। মূত্রপাতের ছড়ছড়ে শব্দের ওপর গলা তুলে সেনগুপ্ত বলল, খবর শুনেছেন। দে আর স্যাক্ড। আপনি তো হিরো বনে গেলেন মশাই।

হিরো কেন? প্রশ্নটা না করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেনগুপ্তের দিকে একঝলক তাকাল সুব্রত। কিছু কিছু লোক আছে যারা খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পারে না। এক একজন এক একরকম। যেমন সে নিজে প্রয়োজন ছাড়া বেশিক্ষণ আলাপ জমাতে পারে না।

চেম্বারে ফিরে এল সুব্রত। জল খেল একদমে। বাঁ দিকের ক্যাবিনেট থেকে নীল রঙের একটা ফাইল বার করল। ওর ব্যক্তিগত ফাইল। ওই ঘটনা সংক্রান্ত যতগুলি চিঠি লিখেছে বা পেয়েছে সমস্ত কিছু রাখা আছে ফাইলের মধ্যে। শেষ থেকে দ্রুত চিঠিগুলো ওল্টাতে শুরু করল। আরম্ভ হয়েছিল একটা সামান্য ট্রান্সফার অর্ডার নিয়ে। তারপর ঘেরাও, মারধোর। থানা, হাসপাতাল। দুই ইউনিয়নের সংঘর্ষ। তারপর ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির শিখরে এনকোয়ারি কমিশন। এবং অবশেষে আজ দীর্ঘ একবছর পর কমিশনের রায়। জয়ন্ত বিশ্বাসের ইউনিয়ন নিশ্চয়ই এই রায় সহজে মেনে নেবে না। এই তিনজন কর্মচারীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ। রাজনীতির অদৃশ্য সুতোটিকেও দেখতে পাচ্ছে সুব্রত। আর এই সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। দাঁড়িয়ে আছে ঠিক মাঝখানে।

সামান্য শীত করছে। বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আগে বেয়ারা, পেছনে বৃদ্ধ রাধানাথবাবু। বেয়ারাকে এয়ারকুলারের রেগুলেটার কমিয়ে দিতে বলে, বসার ইঙ্গিত করল রাধানাথকে। ফাইলে চোখ রেখেই বলল, বলুন।

—স্যার। আমার আর রিটায়ারমেন্টের দু মাস আছে। এই শেষ বয়সে আর ঝামেলায় জড়াতে চাইছি না। তিনজনকে না কি বরখাস্ত করা হয়েছে। চিঠিগুলো অন্য কাউকে দিয়ে ডেসপ্যাচের ব্যবস্থা করুন স্যার।

তিনটে মুখবন্ধ খাম টেবিলে রাখল রাধানাথ। খামের ওপর পরিষ্কার করে লেখা নাম-ঠিকানা। দ্রুত নামগুলি দেখে নিয়ে রাধানাথের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল সুব্রত। চলে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বেয়ারা। সুব্রত সময় নিল। বেয়ারা বেরিয়ে যাবার পর আক্রমণাত্মক কণ্ঠে বলল, ঝামেলার কি আছে—তাছাড়া এটা তো আপনার ডিউটি। অন্য কেউ করবে কেন?

—ঠিকই স্যার। কিন্তু এ ধরনের চিঠি তো অনেকসময় ওপরমহল থেকে ডাইরেক্ট ডেসপ্যাচ করা হয়। মানে, আগে হয়েছে। তাই বলছিলাম, এবারও যদি—ইউনিয়নের প্রেসারের ব্যাপারটা বোঝেন তো স্যার। এই থার্টি-ফাইভ ইয়ার্স সার্ভিসে কখনও না বলিনি স্যার। মুখ বুজে কাজ করে গেছি। এই আমার ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট রিকোয়েস্ট।

—আমি বুঝতে পারছি না আপনি এ ধরনের রিকোয়েস্ট কেন করছেন। আর আমার কাছেই বা এসেছেন কেন। আপনার ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জের কাছে যান। যা বলবার ওনাকে বলুন।

—উনি আজ অ্যাবসেন্ট স্যার।

—আমি জানি না। আপনার যা মনে হয় করুন। বেটার গো টু ইওর সেক্রেটারি।

ইউনিয়ন সম্পর্কে বক্রোক্তি করতে যাচ্ছিল সুব্রত। শেষমুহূর্তে সংযত করল নিজেকে। বিপদের সময় ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। কোনো উত্তেজনা নয়। দু দিকেই সমদূরত্ব রেখে ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। বিরস মুখে উঠে পড়ল রাধানাথ। রাধানাথের দরজা খোলা আর বন্ধের ওই সামান্য সময়টুকুতে ভেসে এল বাইরের গুঞ্জন। আর গুঞ্জন ছাপিয়ে সমবেত স্লোগান। চমকে উঠল সুব্রত। উৎকর্ণ হয়ে সে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল চুপ করে। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ছন্দময় স্লোগান। যেন সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া ধারাবাহিক ঢেউ। নিচের ফ্লোর থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে মিছিল। বিপদের গন্ধ পেল সুব্রত। কী করতে চায় ওরা? আবার একটা ঘেরাও, কাজ বন্ধ, না কি আরো সাংঘাতিক ধরনের কিছু যা ভাবা যায় না। এমন কেউ যদি থাকত যে, সুব্রতকে এই সমস্ত গোপন খবর এনে দিত। চোখ বন্ধ করে সুব্রত শুনল একটা ফিসফিসে চাপা কণ্ঠস্বর, স্যার—ভয় নেই। আপনি আমাদের টারগেট নন—আপনি তো নিমিত্তমাত্র। আপনি হলেন যাকে বলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেই দাবার ঘুঁটি। তাছাড়া কমিশনের কাছে আপনার পজিটিভ রোল আমরা লক্ষ্য করেছি স্যার।

স্লোগানের শব্দ এবার আছড়ে পড়ে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ম্যানেজমেন্টের দালাল হুঁশিয়ার—শ্রমিক কর্মচারী হ্যায় তৈয়ার। সুব্রত কাজে মগ্ন থাকার ভান করল। দরজাটা অর্ধেক খুলে পাল্লার সামনে চেয়ার বসিয়ে দিল একজন। ওরা শোনাতে চায়। সুব্রত আড়চোখে তাকাল। ডিপার্টমেন্টের মাঝপথ দিয়ে মিছিল চলে যাচ্ছে। গলায় ঝাঁঝ থাকলেও ওদের আচরণ বেশ সংযত। অনেকেরই বেশ গা-ছাড়া হাসিহাসি মুখ, যেন প্রহসন নাটকের স্বতঃস্ফূর্ত দর্শক। সমবেত থেকেও কর্মচারীদের এই আপাত বিচ্ছিন্নতায় খানিকটা আশ্বস্ত হল সুব্রত। আসলে মিছিলের সঙ্গে ততক্ষণই এরা আছে যতক্ষণ না নিজে বিপদগ্রস্ত হয়। এই লোকগুলোকে সে তবু জানে। এদের প্রত্যেকটি চাউনি, উত্তেজিত কথা বলার ভঙ্গি বা ঠোঁটের দু-পাশ থেকে উঠে আসা তরতরে হাসি সবেরই অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে নিতে বেশি সময় লাগে না ওর। সত্যি বলতে, দুর্বোধ্য যা কিছু সবই ওপরের দিকে। সুব্রতর একযুগব্যাপী অভিজ্ঞতাও মাঝে মাঝে অসহায় হয়ে পড়ে সেখানে। ঐ জেনারেল ম্যানেজার। যেন নিরাকার ঈশ্বরের চর্বিময় সংস্করণ। ভাবলেশহীন মুখ। ব্রাঞ্চ অফিসের ঘটনাটার পর অনেকবার যেতে হয়েছে ওর কাছে। কফি খাইয়েছেন। কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে মৃদু উপদেশ। ম্যানেজমেন্ট কী চায়, কোন ইউনিয়ন খারাপ, কোনটা আরো খারাপ এবং ম্যানেজমেন্টের ফোকাল পয়েন্টে বসে সুব্রতর কোর্স অফ অ্যাকশন কী হওয়া উচিত ইত্যাদি প্রভৃতি। গীতা থেকে সংস্কৃত শ্লোক পর্যন্ত আউড়েছেন উনি। অথবা ঐ পার্সোনাল ম্যানেজার। তখন এনকোয়ারি কমিশন চলছে। দ্বিতীয় দিন সান্ধ্যের পর লিফটে দেখা হল পি· এম-এর সঙ্গে। মূর্তিমান এক জলে ভাসমান বরফখন্ড। যতটুকু বলেন, না বলা অংশটুকু তার দ্বিগুণ। শুধু হাসলেন। ঐ এক তৃতীয়াংশের হাসি। উহ্য দুই ভাগের দিকে নজর রাখতে গিয়ে প্রত্যুত্তরের হাসিটুকু পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে ভুলে গেল সুব্রত।

মনে পড়ল, আজকের এই ঘটনাটা ঐ ভাসমান বরফকণ্ঠেই জানতে পেরেছে সে। নিশ্চয়ই প্রথমে নয়, জানানো হয়েছে সবার শেষে। এমনিতে খবরটা তার জানার কথাই নয়। কিন্তু তবু উনি ফোন করেছিলেন কেন? অবস্থাটা এমনই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে, আজ কোনকিছুই উদ্দেশ্যহীন বলে ভাবতে পারছে না সুব্রত। মাথাটা দপদপ করছে। গলায়, কপালের কাছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ইনটারনালে সিক্স সেভেন ঘোরালো সুব্রত। ও প্রান্তে ফোন বেজে যাচ্ছে। পি· এম ঘরে নেই। নিশ্চয়ই জোনাল ম্যানেজারের চেম্বারে আড্ডা মারছে। দুটিতে খুব ভাব। সম্পর্কে ভায়রা ভাই। থ্রি নাইন ঘোরালো। জোনাল ম্যানেজারের ঘরেও ক্রমাগত রিং হয়ে গেল কেউ নেই। ওপরমহলের কোনো জরুরী মিটিং চলছে হয়তো। পরপর ডায়াল করলো বোর্ডরুম, ডেপুটি-জেনারেল ম্যানেজার। কোন উত্তর নেই শেষে জেনারেল ম্যানেজার। পি· এ জানাল, উনি নেই স্যার। বেরিয়েছেন আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি নিয়োগী বলছি। এস নিয়োগী। স্যার কখন ফিরবেন

—বলতে পারছি না স্যার। পার্ক হোটেলে একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেছেন। আজকে নাও ফিরতে পারেন।

—ও· কে।

ফোন রেখে ঘড়ির দিকে তাকাল সুব্রত। তিনটে পঁয়ত্রিশ। অর্থাৎ এই রণক্ষেত্রে এখন সে সম্পূর্ণ একা। যেন ভোজবাজির মত কর্তাব্যক্তির সব উধাও হয়ে গেল চোখের নিমেষে। কথাটা চিন্তা করেই আরো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দ্রুত গুছিয়ে নিল টেবিল। প্রত্যেকটা মুহূর্তের দাম আছে নীল ফাইলটা যত্ন করে রাখল অ্যাটাচির সুরক্ষিত খাপে। কপালে ঘাম গড়াচ্ছে রুমাল দিয়ে কপাল, ঘাড় মুছে নিল। আবার কান পাতল বাইরের শব্দে ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে সেই স্লোগান।

হ্যাঙ্গার থেকে কোট তুলে গুছিয়ে নিল হাতের ওপর। আয়নার দিকে তাকাল। বুঝতে পারল একটু বেশিই ভয় পেয়েছে। নিজের শুকনো কালো ঠোঁট দুটো পর্যন্ত ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করেছে। ভয়টা কাটানোর জন্য চোখ বন্ধ করে নবনীতার শরীরটা মনে করতে চেষ্টা করল। এর আগেও অনেক সময় এইভাবে পরিত্রাণ পেয়েছে সে। নবনীতার কথা ভেবে বহু বিরক্তিকর বাস্তবতা কাটাতে পেরেছে সুব্রত। আশ্চর্য, বিয়ের আট বছর পরও এই একটিমাত্র নারীশরীর একইভাবে আকর্ষক থেকে গেল। আয়নার দিকে চেয়ে সামান্য হাসল সুব্রত। কারণ এমন এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও নবনীতাময় সেই যৌনতার কার্যক্ষমতা এতটুকু কম নয়। মনে করার চেষ্টা করল গতরাতের সেই দৃশ্য। ড্রেসিংটেবিলের সামনে নবনীতা। পরনে স্বচ্ছ নাইটি। টুইজার দিয়ে ভ্রুর বাড়তি লোমগুলি তুলে ফেলছে ব্যস এইটুকুই যথেষ্ট। চিন্তাটা মাথায় রেখে চেম্বারের বাইরে এল সুব্রত

জুনিয়ার অফিসারকে ডিপার্টমেন্ট দেখতে বলে যখন লিফটের দিকে এগিয়ে গেল তখন তার মুখে অফিসারসুলভ প্রত্যয়ের রেখাগুলি আবার ফিরে এসেছে। প্রতিটি পদক্ষেপ, হাতের দোলন, ঘাড় ঘোরানো এমনকি টাই-এর সমান্তরাল অবস্থান পর্যন্ত নিখুঁত এবং যথাযথ। মাঝের ফ্লোরে মিটিংজাতীয় কিছু হচ্ছে। নেমে যাওয়া লিফটের মধ্য থেকে শব্দের তারতম্যে বুঝতে পারল সে লিফট থেকে গ্যারেজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি



সেলামের উত্তরে যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল।

বেসমেন্ট গ্যারেজে পা দিয়েই চমকে উঠল সুব্রত। গ্যারেজ সম্পূর্ণ ফাঁকা। শুধু তার গাড়িটাই দ্বীপের মত নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বুটের প্রতিটি শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আবার ভয়টা পেয়ে বসছে। ওরা সকলেই নিঃশব্দে চলে গেছে। বিশাল গ্যারেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল সুব্রত। কেউ নেই। সে একা। সামনে শুধু ওই কালো অ্যাম্বাসাডার আর তার মধ্যে ঘুমন্ত ড্রাইভার রামকুমার। অপরাধীর মত নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ফিসফিসে কণ্ঠে ডাকল, এই রামকুমার—জলদি। ঘর যানা হোগা।

গাড়িতে বসেই আবার সাহস ফিরে পেল সুব্রত। আয়েসী ভঙ্গিতে একটা হাত ছড়িয়ে দিল সিটব্যাকে। বেসমেন্টের আধোঅন্ধকার সরিয়ে গাড়ি উঠে পড়ল রাস্তায়। ব্যাকস্ক্রিন দিয়ে অফিস বিল্ডিংটিকে লক্ষ্য করল শেষপর্যন্ত যতক্ষণ না গাড়ি ডানদিকে বাঁক নিয়ে ছুটে চলল তার বাড়ির দিকে।

এখন বেশ হালকা লাগছে। আর কোনো ভয় নেই। একটা সিগারেট ধরাল। চোখ বন্ধ করতেই ভেসে উঠল গতরাতের সেই দৃশ্য। ড্রেসিংটেবিলের সামনে নাইটি পরিহিতা উদ্ধত নবনীতা। ক্রীমমর্দিত শাণিত মুখমন্ডল। টুইজার দিয়ে ভুরু বাড়তি লোম তুলছিল। গত দুদিন প্রায় কথা বন্ধ। ইউরিন রিপোর্টে ধরা পড়েছে নতুন সন্তান-সম্ভাবনা। রিপোর্ট পাওয়ার পর থেকেই নবনীতা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও বলেনি। গতকাল সকালের দিকে সুব্রতকে শুনিয়ে শুধু একটা কথাই বলেছিল, তাহলে আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই? অথচ দশমাসের ঝামেলাটা আমাকেই সহ্য করতে হবে।

সুব্রত তখন কোনো উত্তর দেয়নি। আসলে নবনীতার আপত্তি সত্ত্বেও দ্বিতীয় সন্তান সে চেয়েছিল এটা ঠিকই কিন্তু এর জন্যও যে একটা যুক্তি থাকা দরকার সেটা কখনো ভেবে দেখেনি। গতকাল অফিসের কাজের মধ্যে মধ্যে স্বপক্ষের যুক্তিগুলি গুছিয়ে নিয়েছিল সুব্রত।

নবনীতার তেত্রিশ চলছে। যদি হতেই হয় তো আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাছাড়া অ্যাক্সিডেন্টলি যখন ব্যাপারটা ঘটেই গেছে তখন সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করাই উচিত। সুব্রত নিশ্চিত ছিল যে, শেষমেষ সে নবনীতাকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে নেবে।

রাতে নবনীতা যখন ড্রেসিংটেবিলের সামনে, তখন বিছানায় আধশোয়া সুব্রত পরপর যুক্তিগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিল নিজের মধ্যে। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে নবনীতার দিকে। দেখছিল টুইজারের চকিত বিকর্ষণ। মৃদু যন্ত্রণায় কুঁচকে-ওঠা মুখমন্ডল, নাক। চকচক করছে ঠোঁট ও গালের চূড়াগুলি। টুইজার রেখে মুখময় আর এক প্রস্থ ক্রীম ঘষছে নবনীতা। মাথা হেলিয়ে দিয়েছে পেছনে। নৃত্যভঙ্গিতে হাত নেমে আসছে গলায়, ঘাড়ে ও বুকের উর্ধ্বাংশে। নাইটির ফাঁকে উপচে ওঠে স্তন। মোহিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল সুব্রত। যৌন আলোর প্রচন্ড ঝলকানিতে ভেঙে যাচ্ছিল সমস্ত যুক্তিবোধ। সুব্রতর মনে হয়েছিল চরম আনন্দের জন্য এই মোহময়ী নারীটিকে তার এখনই দরকার। এই মুহূর্তে এবং যে কোনো মূল্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত নবনীতার চোখ লক্ষ্য করে বাড়িয়ে দিয়েছিল আনুগত্যের হাসি। বিনিময়ের হাসি।

নবনীতা যেন জানত যে, এইভাবেই সাড়া দেবে সুব্রত; তাই সেও হেসেছিল। আর পারেনি সুব্রত। নিজেকে অস্বীকার করেই বলেছিল, তাহলে ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে কথা বলি। নষ্ট যদি করতেই হয়, লেট করা ঠিক হবে না।

নবনীতার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কোমরের কাছে নাইটির বেল্ট খুলে আরো শক্ত করে বাঁধল। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে গেল সংলগ্ন বাথরুমে। জুন্টা ঘুমোচ্ছে একপাশে। রাতের আলো জ্বেলে শুয়ে পড়ল সুব্রত। প্রায় বারো ঘন্টা ধরে যে যুক্তিগুলি সে গুছিয়ে নিয়েছিল এখন সবই তার কাছে অর্থহীন এবং বাড়তি বলে মনে হচ্ছে। বাথরুম থেকে নবীনতা ফিরে আসার পর সেই নবলব্ধ আনুগত্যের সুরে বলল, নীতু, প্লীজ আর রাগ কোরো না। লক্ষ্মী মেয়ে।

আর প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মী মেয়ের মতই তার জাদু শরীরটিকে মেলে ধরেছিল নবনীতা। এবং বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ অন্য দিনের থেকে আরো সক্রিয়ও হয়েছিল সেই রাতে। চোখ বুজে রাতভোর সেই সম্ভোগদৃশ্যের কথা চিন্তা করছিল সুব্রত। গাড়ি চলছে। এখন অনেকটা ঝরঝরে লাগছে। ফুরফুরে হাওয়া খেলে যাচ্ছে চুলের অভ্যন্তরে। ঘনিয়ে-আসা ভয়টাকে কাটাতে পেরে বেশ তাজা বোধ হচ্ছে।

তিনতলার ওপর ফ্ল্যাট। গাড়ির জানলা দিয়ে ব্যালকনির দিকে তাকাল সুব্রত। কেউ নেই। না থাকায় আনন্দিত হল মনে মনে। নবনীতা আর জুন্টাকে বেশ চমকে দেওয়া যাবে। সুব্রত চিন্তা করল দিনের আলো থাকতে থাকতে এর আগে কবে সে বাড়ি ফিরেছে। মাঝে জুন্টার অসুখের সময়

বোধ হয় একদিন একটু আগে চলে এসেছিল। গাড়িকে বিদায় করে যখন সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল তখন সে একজন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ। খানিক আগে যে বিপর্যয় তাকে গ্রাস করেছিল তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই আর। তাজা ভাবটিকে ধরে রাখার জন্য প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুনগুনানি সহ কলিংবেলে চাপ দিল সুব্রত। এই অসময় প্রত্যাবর্তনটিকে যথাসম্ভব রসোত্তীর্ণ করার ইচ্ছে ছিল তার। দরজা খুলল কাজল। কাজের মেয়ে।

চটিজুতোর র‍্যাকে শূন্যস্থান দুটিকে লক্ষ্য করে সুব্রত বুঝল যে, ওরা বাড়ি নেই। ঘড়ির দিকে তাকাল। সবে পাঁচটা। চিৎকার করে উঠল, কাজল বৌদিরা কোথায় ?

—বৌদি-জুন্টা একডালিয়ায় গেছে। ফিরতে রাত হবে। আপনাকে ফ্রেঞ্চ টোস্ট আর চা বানিয়ে দিতে বলেছেন। এখন দেব ?

কোনো উত্তর দেয় না সুব্রত। একডালিয়া মানে নবনীতার বাপের বাড়ি। বানানো সুখবিলাসটুকু ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে। এক একটা দিন এইরকমই হয়। এমনই দুর্দিন। কিছুই করার নেই, কোথাও যাওয়ার নেই। এমনকি কথা বলার মানুষগুলোও দূরে চলে যায়। আশ্চর্য, নবনীতা বা জুন্টার সঙ্গ এর আগে কখনো এত প্রয়োজনীয় মনে হয়নি তার। আসলে সে আর একা থাকতে চাইছিল না।

অফিসের জামাপ্যান্ট পাল্টে খবরের কাগজটা নিয়ে বসল সুব্রত। উল্টেপাল্টে পুরোটা পড়ে ফেলল। অপ্রয়োজনীয় সংবাদ এমনকি দ্বিতীয় পাতার বিজ্ঞাপনগুলোও বাদ গেল না। একসময় কাগজটা ছুঁড়ে সরিয়ে দিল। সোফায় মাথাটা এলিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে রোজই সাড়ে সাত বা আটটা হয়। তারপর ব্যালকনির অন্ধকার ইজিচেয়ারটিতে চুপচাপ বসে থাকে কিছুটা সময়। ওখানেই চা আর সামান্য জলখাবার পাঠিয়ে দেয় নবনীতা। তারপর জুন্টার পড়াশুনা একটু আধটু দেখে দেয় কিংবা টি· ভির চিত্রমালা বা ঐ জাতীয় কিছু। দশটার মধ্যে রাতের খাবার এবং বিছানা। এই হল তার দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন রুটিন। আজ হঠাৎ এই রুটিন-এর বাইরে এসে হাঁফিয়ে উঠল সুব্রত।

কয়েকবার পায়চারি করল ঘরের মধ্যে। করুণ দৃষ্টিতে তাকাল ব্যালকনির দিকে। ব্যালকনির ইজিচেয়ারটিকে আজ এতটুকু আকর্ষক মনে হল না। হাই তুলল কয়েকবার। কাজলের রেখে যাওয়া চা-টোস্ট খেতে থাকল অন্যমনে। ড্রেসিংটেবিলের আয়নার দিকে তাকাল। চোখদুটো বসে গেছে। নিষ্প্রভ ফ্যাকাসে মুখমন্ডল। মনে পড়ল কমিশনের আর এক দিন।

চুরুট ধরিয়ে নিলেন মিঃ গুপ্তা তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, আপনাকে স্লাইট অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন মিঃ নিয়োগী ? এনিথিং রঙ ?

—না, মানে রাত্তিরে ঠিক সাউন্ড স্লিপ হচ্ছে না।

মৃদু হাসিসহ মাথা দোলালেন মিঃ গুপ্তা। যেন পোক্ত মনস্তত্ত্ববিদের মতো উনি বুঝে ফেলেছেন এই নিদ্রাহীনতার অন্তর্নিহিত কারণ। ফুকফুক করে কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়লেন মিঃ গুপ্তা। কড়া গন্ধ আর নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। তারপর বললেন, শুনুন আপনার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ঘেরাওকারীদের মধ্যে অচেনা কিছু লোকও ছিল। অর্থাৎ ইউনিয়ন বাইরের থেকে লোক এনেছিল। রাইট ?

—অন্য ব্রাঞ্চ অফিসের লোকও হতে পারে স্যার।

—হতে পারে নয় তাই হয়েছে। কারণ আপনার ডেসক্রিপশন অনুসারে যে তিনজনের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করা হয়েছে তারা সকলেই অন্য ব্রাঞ্চের কর্মচারী। অ্যান্ড ওয়ান অফ দেম ইজ আ অফিস বিয়ারার। আচ্ছা, আপনি আরো লিখেছেন যে, ঘেরাওকারীরা আপনার প্রতি বাজে ভাষা ব্যবহার করে এবং সেইদিন দ্যাট সিক্সটিনথ্ ডিসেম্বর উত্তেজিত বচসার সময় ঐ তিনজন আপনাকে ফিজিকালি অ্যাসাল্ট করে। রাইট ?

—এর মধ্যে প্রতি ঘন্টায় আমি হেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তাদের ইনস্ট্রাকশন চেয়েছিলাম। বারবার বলেছিলাম ইন্টারভেন করতে, সেটেল করতে কিন্তু কোনো রেসপন্স পাইনি।

—এটা অন্য প্রসঙ্গ মিঃ নিয়োগী। কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে এটা পড়ে না।

—কিন্তু স্যার হেড অফিসের ইনঅ্যাকশনের জন্যই এটা হয়েছে। এর আগেও ছোটখাট ঘেরাও হয়েছে। প্রত্যেকবারই আমি অ্যাকশন নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু হায়ার অথরিটি কখনই গ্রীন সিগনাল দেয়নি। ঘটনাটা নিশ্চয়ই এতদূর গড়াত না যদি স্যার প্রিভিয়াস ইনসিডেন্টগুলো ঠিকভাবে ডিল করা হত।

—সরি, মিঃ নিয়োগী। এই কমিশন কিন্তু সিক্সটিনথ্ ডিসেম্বর অ্যাকচুয়ালি কী ঘটেছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে দোষী ব্যক্তিদের কতটা শাস্তি হওয়া উচিত তা নির্ধারণের জন্যই গঠন করা হয়েছে। ঘটনাটি কেন ঘটেছিল তার জন্য নয়। তাই তো ?

কথাগুলি বলে সমর্থনের চোখে তাকিয়ে থাকলেন মিঃ গুপ্তা। সামান্য নিস্তব্ধতা। নিজেকে সাবধান করল সুব্রত। কমিশনের সামনে ওপরওলাদের সমালোচনা করা ঠিক হয়নি। পরে পস্তাতে হতে পারে। হয়তো হার্ডশিপ এরিয়ায় বদলি অথবা সামান্য কোনো কারণে এফিসিয়েন্সি বারের গিলোটিন। একটু আগেই যা বলেছে তার জন্য শঙ্কিত বোধ করল। কথাগুলি ফিরিয়ে নিতে পারলে হত। কপাল ঘেমে উঠল সুব্রতর।

আধোতন্দ্রার মধ্যে টেলিফোনের শব্দ শুনল সুব্রত। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বেডরুমের দিকে। রিসিভার তুলে নেবার পূর্ব মুহূর্তে বুকের আওয়াজ শুনতে পেল। ভয় করছে। মনে হল ফোনের ওপ্রান্তে একটা ভারী কণ্ঠ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মৃত্যুর হুমকি, অকথ্য খিস্তি কিংবা ঠান্ডা উপদেশ। গলায় যতটা সম্ভব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে বলল, হ্যালো। সুব্রত নিয়োগী।

—মিঃ নিয়োগী, রায় বলছি। আগামীকাল সকাল দশটায় এম· ডির বাড়িতে আর্জেন্ট মিটিং। ইউনিয়নের লোকেরা হেড অফিসে অবস্থান করছে। ওরা বাই ফোর্স কাউকে ঢুকতে দেবে না। সকালের মিটিং-এ আমাদের নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন ঠিক হবে। ও· কে ? ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ি অ্যাট ট্রাঙ্গুলার পার্ক। সকাল দশটা। গুড নাইট।

ফোন ছেড়ে দিল ওপ্রান্তে। পি· আর· ও মিঃ রায়ের গলা। সুব্রতর আরো কিছু জানার ছিল। প্রতি মিনিটে কত কি ঘটে চলেছে। দুপক্ষেই নানান প্রস্তুতি। সুব্রত বুঝতে পারল যুদ্ধের এই প্রস্তুতিপর্বে কেউই তাকে আর প্রয়োজনীয় বলে মনে করছে না। অথচ এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। বিছানায় শুয়ে পড়ল সুব্রত। এলোমেলো অনেক চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। অতলস্পর্শী বিচ্ছিন্নতা আর একাকিত্বের চাপে বিপর্যস্ত বোধ করল সে। রাগ হচ্ছিল নবনীতার ওপর। ও থাকলে হয়তো অসহায় লাগত না। দেয়ালঘড়ির টিকটিক শব্দ। নিচের রাস্তা থেকে উঠে-আসা গাড়ির ধাবমান শব্দ। প্রত্যেকটা মিনিট কত দীর্ঘ। দিনযাপনের গ্লানি ক্রমশ বিমর্ষ করে তুলছিল তাকে। আগামীকালের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। ভাবনার মাঝখান থেকে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সুব্রত।

ঘুম ভাঙল নবনীতার ডাকে। সেন্টের হালকা গন্ধ। মাথায়, কপালে নরম হাতের স্পর্শ। নবনীতার দিকে তাকাল সুব্রত। অন্যদিন হলে সঙ্গে সঙ্গে আদর বাড়িয়ে দিত। আজ পারল না। নবনীতা বলল, কী হল মাথা ধরেছে ?

—জুন্টা কোথায় ?

—ও বাড়িতে রেখে এসেছি।

বিরক্তির সঙ্গে তাকাল সুব্রত। নবনীতার হাত সরিয়ে উঠে বসল। নবনীতার উপস্থিতিটুকু অগ্রাহ্য করতে চাইছিল। সিগারেট-দেশলাই নিয়ে পা বাড়াল ব্যালকনির দিকে।

অপমানিত বোধ করল নবনীতা। কাটাকাটা স্বরে বলল, মাকে নিয়ে ডাঃ মুখার্জির ওখানে গিয়েছিলাম। কাল তিনটেয় টাইম দিয়েছে। ওনার নার্সিংহোমেই হবে।

নবনীতা একাই সব ঠিক করেছে। গর্ভস্থ সন্তান আর নবনীতার মাঝখানে দাঁড়ানো একজন প্রয়োজনহারা পুরুষ বলেই মনে হল নিজেকে। প্রচন্ড ক্রোধে কেঁপে উঠছিল সুব্রত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এর বেশি সে পারে না। অফিসে বাড়িতে একই ভূমিকা। মিডল ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ যাকে বলে মেজকর্তা। ব্যালকনির ইজিচেয়ারে মাথা এলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুব্রত।

সেই শ্বাসপ্রবাহকে লক্ষ্য করে নবনীতা বলল, অফিসে ফোন করেছিলাম। বলল বেরিয়ে গেছে। কাজল বলেছিল, বিকেলে ফিরেছ। কী ব্যাপার?

প্রথমে উত্তর দিল না সুব্রত। হঠাৎ বলল, আর সবুর সইছিল না? এতদিন গেছে নয় আরো দুদিন যেত। এত নাচানাচির কী আছে?

—নাচানাচি কে করছে? অবুঝের মতো কথা বলছ কেন? ডাঃ মুখার্জির থেকে তুমি নিশ্চয়ই বেশি বোঝ না। উনি বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাল দুপুরে উনি ফ্রি আছেন তাই এইরকম ঠিক হল।

—তাহলে নয় থাকত। আমাদের এমন কিছু প্রবলেম নেই যে—।

—না। প্রবলেমটা আমার, তোমার নয়। তাছাড়া আমরা কেউই এখন চাইনি। ইট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। তার মানেই যে এটাকে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আর যখন উপায় আছে।

—ব্যস, তাহলে মিটেই গেল। ব্যাপারটা যখন তোমার তখন আমাকে জড়ানোর কোনো দরকার নেই। যা টাকা লাগবে দিয়ে দেব। গাড়ি পাবে না। অফিসে গন্ডগোল।

নবনীতা ব্যঙ্গের সুরে বলল, বাঃ, বেশ আদর্শ স্বামীর মতো কথা বলছ তো। শুধু টাকা আর গাড়ি দিয়েই দায়িত্ব সারবে?' ঠিক আছে, আমি দাদাকে নিয়েই যাব। টাকা ওই দেবে।

নবনীতা চলে গেল ভেতরের দিকে। সিগারেট ধরাল সুব্রত। অধৈর্য হলে কোমরের কাছে টনটন করে। যুক্তিগুলো কেমন যেন গুলিয়ে যায়। অনেক অকাট্য যুক্তি পরে মাথায় আসে। বাকি সময়টুকু সেই সব যুক্তির মারপ্যাঁচে নবনীতার সঙ্গে নীরব লড়াই চালিয়ে গেল সুব্রত। খাবার টেবিল থেকে বিছানায় শুয়ে পড়া পর্যন্ত একটাও কথা হল না ওদের মধ্যে। একইভাবে নবনীতা ড্রেসিংটেবিলের সামনে শাড়ি পালটে নাইটি পরল। ক্রীম মাখল মুখে। হেঁটে গেল বাথরুমের দিকে।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল সুব্রত। গতকালের মত সে কোনো দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেবে না আজ। অ্যাবরশনের পর যদিও বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকবে তবু সম্ভোগের তাড়নাটুকু প্রাণপণে দমন করল সুব্রত। আত্মসমর্পণের ইচ্ছেটুকু সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লাগল। শরীরবৃত্তির কাছে পর্যুদস্ত সুব্রত স্থির হল অনেকটা পর, যখন গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে সে বুঝল যে নবনীতা ঘুমিয়ে পড়েছে। চুপচাপ শুয়ে থাকল সুব্রত। ঘুম আসছে না। ভেসে উঠল পরপর কয়েকটা দৃশ্য।

১৬ ডিসেম্বর। ইউনিয়নের লোকেরা ঘিরে ধরেছে। অনেককেই চিনতে পারল না। মাথা ঠান্ডা করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকল। মাঝে মাঝে স্লোগান, বিদ্রূপ আর হালকা ধরনের গালাগাল। বারবার সেই এক কথা, একই হুমকি, রেজিস্টারে আবার নাম তুলুন, আমরাও ঘেরাও তুলে নেব। পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা-ছটা-সাতটা। সাড়ে সাতটার সময় সুব্রত বলল, আমি বাড়ি যাব। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড হৈচৈ। একজন চেপে বসিয়ে দিল। সুব্রত বলল, গায়ে হাত দেবেন না। কে যেন মাথার পেছনে চাঁটি মারল। সুব্রত ঘুরে দেখতে যাচ্ছিল ভিড়ের চাপে ছিটকে সরে গেল অন্যদিকে। প্রবল চিৎকার, ধস্তাধস্তি। সুব্রতর মুখ লাল, মাথা ঝনঝন করছে। তোতলা কণ্ঠে বলল, প্লিজ, আমাকে যেতে দিন। একসেস করবেন না। কথা শেষ করার আগেই চড়, ঘুসি, তারপর জটলা ভেদ করে একটা লাথি এসে পড়ল ওর তলপেটে। পেট চেপে বসে পড়ল সুব্রত।

১৭ ডিসেম্বর। পার্সোনাল ম্যানেজার আর মেডিকাল অফিসার বাড়িতে এসে দেখা করল। একরকম জোর করেই নিয়ে গেল হাসপাতালে। প্রাথমিক পরীক্ষার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। একমাসের জন্য ছুটি চাইল সুব্রত।

২০ ডিসেম্বর। ইউনিয়নের লোকেরা দুঃখপ্রকাশ করবে। করলে কি হত বলা যায় না। অবশেষে তিনদিন অপেক্ষা করার পর ম্যানেজমেন্টের কাছে পুরো ঘটনাটা লিখিতভাবে জানাল সুব্রত।

৩০ ডিসেম্বর। সুব্রতকে বদলি করে হেড অফিসে ইনসপেকশন ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ করা হল।

১২ জানুয়ারি। জেনারেল ম্যানেজার ডেকে পাঠাল সুব্রতকে। নিজের মুখে ঘটনাটি শুনল। কফি খাওয়া হল। ফেরার পথে নবনীতার জন্য একটা দামী তাঁতসিল্ক কিনল সুব্রত।

২৩ জানুয়ারি। ছুটির দিন। অপর ইউনিয়নের প্রথম সারির নেতা অনাদি দাস দেখা করল বাড়িতে। বলল, এ ধরনের হুলিগানিজম্ বন্ধ হওয়া দরকার। জয়ন্ত বিশ্বাসের ভুল নেতৃত্ব কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি করছে। আপনাদের মতো সৎ অফিসারদের কাজ করতে দিচ্ছে না। ম্যানেজমেন্টের এনি অ্যাকশন আমরা সাপোর্ট করব। সুব্রতর মনে পড়ল অনাদি দাসের ইউনিয়নও দীর্ঘদিন ধরে অফিসারদের হুমকি দেওয়া, পেটানো সবই করে আসছে। অনাদি দাসকে বিদায় দেওয়ার সময় ওর মনে পড়ল চালুনি আর সুচের গপ্পো।

১১ ফেব্রুয়ারি। পি.এম ডেকে বললেন, মিঃ নিয়োগী আপনার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে। কোনরকম ডিভিয়েট করবেন না। তাছাড়া অন্য কারণেও এই ইউনিয়নকে থ্রাশ করার দরকার ছিল। 'অন্য কারণ' শব্দ দুটিকে লুফে নিল সুব্রত।

২৮ ফেব্রুয়ারি। হেড অফিস প্রাঙ্গণে অনাদি দাসের নেতৃত্বে ওই ইউনিয়নের এক বিশাল সমাবেশ। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও অংশগ্রহণ করেন। প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, সমস্তরকম গঠনমূলক কাজে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা হবে। এক ঢিলে তিনটি পাখি মারে অনাদি

দাস— মেম্বারদের চাঙ্গা করা, রাজনৈতিক পুচ্ছটিকে তুলে দেখানো এবং ম্যানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করা।

২ মার্চ। ১৬ ডিসেম্বরের ঘটনায় তিনজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হল। পাঁচজনের ওপর ইনক্রিমেন্ট বন্ধের নোটিস এবং সতেরজনকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হল।

৪ মার্চ। জয়ন্ত বিশ্বাসের ডাকে একদিনের ধর্মঘট। অপর ইউনিয়নের লোকেদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হল। হেড অফিস প্রাঙ্গণ পরিণত হল ছোটখাট রণক্ষেত্রে। ধস্তাধস্তি, চিৎকার শেষে পেপারওয়েট বৃষ্টি। দুপক্ষেই আহত হয় কয়েকজন। পুলিস এসে রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়।

৫ মার্চ। ধর্মঘটীরা সাফল্যের কারণে কর্মচারীদের অভিনন্দন জানায়। বিরোধীরা দাবি করে ধর্মঘট ব্যর্থ। অনাদি দাসের ইউনিয়ন কালো ব্যাজ ধারণ করে।

৯ মার্চ। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার জন্য জয়ন্ত বিশ্বাস চব্বিশ ঘন্টার ধরনা চালায়। বিকেল চারটের সময় জি·এম এনকোয়ারি কমিশন গঠনের আশ্বাস দিলে ওরা চলে যায়।

১৩ এপ্রিল। কমিশনের সামনে প্রথম ডাক পড়ে সুব্রতর। এতদিনে সুব্রত বুঝতে পেরেছে সেই 'অন্য কারণ'। ঠান্ডা মাথায় জবাব দেয় প্রতিটি প্রশ্নের। এই রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে সে।

২২ মে। দ্বিতীয়বার ডাক আসে। সুব্রত ম্যানেজমেন্টের সমালোচনা করে শেষে মুসড়ে যায়। ভয়ে গুটিয়ে যায় নিজের মধ্যে।

৩০ মে। পি·এম ডেকে বললেন, মিঃ নিয়োগী। আপনি একজন গুড অফিসার। কাজকর্মের ব্যাপারে বলার কিছু নেই কিন্তু মনে রাখবেন আপনারা হলেন ম্যানেজমেন্টের পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। দুটো আলাদা ক্লাস—ক্লার্ক অ্যান্ড অফিসার। দুজনের আলাদা ইনটারেস্ট। তেলজলে কখনো মিশ খায় না মিঃ নিয়োগী। ইটস্ এ সায়েন্টিফিক ট্রুথ।

৫ জুন। কমিশনে তৃতীয়বার ডাক পড়ল। সুব্রত বুঝেছে যে নিরপেক্ষ কথাটার আসলে কোনো মানে নেই। ম্যানেজমেন্টের যাতে সুবিধে হয় এমনভাবেই উত্তর দিল সে।

১০ জুন। সুব্রত সহ আরো আটজনের প্রমোশন হল। এক কফিপার্টিতে জি·এম অভিনন্দন জানালেন। বিছানায় শুয়ে নবনীতাকে খবরটা জানাল সুব্রত। খুশিতে ডগমগ নবনীতা বলল, তাহলে তোমাকে দুঃসংবাদটা দেওয়া যায়। ডাঃ মুখার্জি পিল খেতে বারণ করলেন। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

সুব্রত বলল, অন্য ব্যবস্থা কিসের ? ধ্যুস। তার চেয়ে সেকেন্ড ইনিংস শুরু করে দাও।

—না বাবা। আমি ওয়ান ডের ভক্ত। এক ইনিংসেই খেলা শেষ।

১৩ জুন। স্বয়ংক্রিয় লিফট হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। ভেতরে সুব্রত আর অপরিচিত এক ভদ্রলোক। মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। অধৈর্য সুব্রত চিৎকার করে উঠল একসময়। অপর লোকটি শান্তভাবে বলল, রেস্টলেস হচ্ছেন কেন, ও ঠিক চলবে। সুব্রতর গরম লাগছে। রিনরিন করে ঘেমে উঠছে শরীর। নিশ্চয়ই এটা একটা নাশকতামূলক কাজ। লিফটের গায়ে দুমদুম পিটিয়ে আওয়াজ করতে থাকল। লোকটা বলল, আঃ, এমন করছেন কেন—আর একটু দেখুন না। দমবন্ধ লাগছে সুব্রতর। মনে হচ্ছে আজীবন এইভাবে ঝুলে থাকতে হবে মাঝখানে। লোকটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল ; সুব্রত আতঙ্কে কেঁপে উঠল, এ কী—না-না আগুন জ্বালাবেন না। লোকটাকে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। মাথা ঘুরছে। গা বমিবমি ভাব। লিফটের মধ্যে বসে পড়ল। যেন অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে আর কোনো পরিত্রাণ নেই। হয়তো সমস্ত বাড়িতেই এখনই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে কিংবা মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাসে ভরে যাবে লিফট্-পথ। সমস্ত শক্তি দিয়ে সুব্রত বলতে চেষ্টা করল, দেখো, আমি কোনো দলের নই। তোমরা কারা ? আমাকে মেরে কোনো লাভ নেই। কিন্তু গলা দিয়ে একটাও শব্দ বের হল না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সুব্রত।

ঘুম ভাঙল অ্যালার্মের শব্দে। নবনীতা আগেই উঠে গেছে। হাতে সময় কম। দ্রুত তৈরি হয়ে নিল সুব্রত। নবনীতার সঙ্গে সামান্যতম বাক্য বিনিময়েরও চেষ্টা করল না। রাতের প্রশ্নটা আবার উঠে আসতে পারে। অফিসের ঘটনাগুলি এমনিতেই তাকে ভারাক্রান্ত করেছে। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যাচ্ছে বারবার। যেন এক গোলকধাঁধার মধ্যে অবিরাম ঘুরে বেড়ানো। এর মধ্যে নবনীতার সঙ্গে আর মনোমালিন্য বাড়াতে চাইল না সুব্রত। অথচ একটা মিটমাট না হলেও শান্ত হতে পারছিল না। ঘুম ভাঙা থেকে দাড়ি কামানো, বাথরুম, অ্যাটাচি গুছিয়ে নেওয়া থেকে খাওয়া পর্যন্ত অন্যমনস্ক সুব্রত যন্ত্রের মত ব্যাপৃত রাখল নিজেকে। শুধু জুতো পরার সময় একবারই সে ফিরে তাকাল নবনীতার দিকে। নবনীতা খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে। নিস্পৃহ কণ্ঠে সুব্রত বলল, আমি তিনটে নাগাদ নার্সিংহোমে যাব। ড্রয়ারে শ দুয়েক আছে, বাকিটা চেক দিয়ে [illegible]। জুন্টাকে কে নিয়ে আসবে ?

—মাকে বলা আছে। সন্ধের পর দিয়ে যাবে। নবনীতারও ছাড়া ছাড়া উত্তর।

আর কথা বাড়াল না সুব্রত। এমন রাগারাগি আগেও হয়েছে কিন্তু কোনবারেই বেশিদূর গড়ায়নি। রাতের বিছানায় কিংবা পরের সকালে মিটে গেছে রাগ-অভিমান। মেটানোর জন্য অবশ্য বরাবরই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে সে। আজ আগ্রহর বদলে বরং বিরক্ত বোধ করল। চারপাশের এই বিপন্নতা তাকে ক্রমশই নির্লিপ্ত করে তুলেছে। গুমরে উঠছে নিষ্ফল আক্রোশ। সুব্রত যখন বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন নবনীতা সম্পর্কে সে অনেকটাই বীতশ্রদ্ধ। এমনকি নবনীতার ঐ জাদু-শরীরটিও অসহ্য বলে মনে হল তার।

স্টপে একটাও ট্যাক্সি নেই। অপেক্ষা করার সময় সুব্রতর মনে হল একটা লোক তাকে অনুসরণ করছে। কোনাকুনি দাঁড়িয়ে বারবার লক্ষ্য করছে। রোগা, চোয়াড়ে চেহারা। ব্রুস লি চুল। প্যান্টের পকেটে হাত। পকেটে মারণাস্ত্র থাকা অসম্ভব নয়। পায়ে পায়ে কয়েক ফুট সরে গেল সুব্রত। ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে না। গাছের আড়ালে চলে গেছে। অনুসরণকারী হলে অবশ্যই উঁকি মারবে। গাছের ফাঁক দিয়ে সুব্রত লক্ষ্য রাখল সেদিকে। দূরে ব্রীজের ওপর থেকে নেমে আসছে ফাঁকা ট্যাক্সি। মরিয়া ভঙ্গিতে ট্যাক্সিকে থামাল সুব্রত। 'ট্রাঙ্গুলার পার্ক' বলে উঠে বসেই ফিরে তাকাল পেছনে। একটা ডবলডেকার। সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটা গেল বাসের দিকে। বিপদের সময় তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়। এখন হল না। ড্রাইভারকে বলল, বাসটাকে আগে ছেড়ে দিন। পাশ দিয়ে চলে গেল ডবলডেকার। পেছনের দরজায় ঝুলন্ত ছেলেটিকে দেখে সুব্রত বলল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। ব্রীজের পাশ দিয়ে চলুন। বড় রাস্তায় জ্যাম হতে পারে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়িতে এই প্রথম। বড় গেটের সামনে ট্যাক্সি থামতেই কেমন যেন নার্ভাস লাগল সুব্রতর। শান্ত, নিরিবিলি রাস্তা। দু-একজন অন্যমনস্ক পথচারী আর ধাবমান গাড়ি ছাড়া সবই নিস্তব্ধ। কোকিলের ডাক ভেসে এল। গেটের দারোয়ান সেলাম করে ভেতরে যাবার অনুমতি দিল। একধারে সিমেন্টের পথ। পাশে বড় লন। লনের মিঠে রোদ্দুর থেকে 'গুডমর্নিং' জানাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার রণবীর সেনগুপ্ত। হাতের ইঙ্গিতে ভেতরে যেতে বলল।

বাড়ির গঠনটা পুরনো। গোলাকার থাম। সামনে কার্পেট মোড়া অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা। বারান্দার পর তিনদিকে তিনটে বড়সড় ঘর। মাঝের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পি· আর· ও মিঃ রায়। দু হাত বাড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন সুব্রতকে। ঘরে ঢুকে বেশ নাটকীয় সুরে মিঃ রায় বলে উঠলেন, ম্যাডাম। মিট আওয়ার চীফ অফিসার মিস্টার সুব্রত নিয়োগী।

শরবত পরিবেশন করছিলেন ভদ্রমহিলা। সেন্টার টেবিলে ট্রে নামিয়ে রেখে চরম অত্যাশ্চর্য কিছু দেখার মতো অদ্ভুত এক স্বর বের হল ওঁর কণ্ঠ



"যখন অতিথিদের হঠাৎ আগমন হয় তখন আমি তাদের স্পেশাল্ ফ্রুট স্যালাড এর উপর পুষ্টিকর ও সরযুক্ত মিল্কমেড দিয়ে চমক লাগিয়ে দি। মিল্কমেড তৎক্ষণাৎ এক চমৎকার স্বাদ এনে দেয়।

...নিয়ে দেখুন। আপনার অতিথিরা খুব পছন্দ করবে।

মিল্কমেড দিয়ে আপনি অনেক কিছুই তৈরী করতে পারেন। প্রতিমাসের ...রের তালিকায় মিল্কমেড যেন থাকে।"

মিল্কমেড টপিংস

মিল্কমেড সরাসরি যে কোনো মিষ্টির উপর দিতে পারেন। কেক, জেলি, পুডিং, ট্রাইফেলের উপর দিয়ে দেখুন...

আপনি ফ্লেবারযুক্ত মিল্কমেড টপিংও বানাতে পারেন— চকলেট, লেমন, আরেঞ্জ মিশিয়ে। যে ভাবে আপনি পছন্দ করেন।

এক সেট রঙ্গীণ নতুন মিল্কমেড রান্নার প্রণালী কার্ড।
পরিষ্কার বড় হরফে এই ঠিকানায় লিখুন
মিল্কমেড রেসিপি সার্ভিস
পোস্ট বক্স : 7177 নিউ দিল্লী-110002



চমৎকার মিষ্টির বাহার আনে মিল্কমেড

থেকে। দু-চোখে অপার বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, অবভিয়াসলি দ্যাট নিয়োগী, আই মিন, হু বেলস্ দি ক্যাট—অ্যাম আই রঙ মিঃ রায় ? ঘুরে তাকালেন পি· আর· ও-র দিকে।

ঘরে মৃদু হাসির গুঞ্জন। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল সুব্রত। ভদ্রমহিলার স্মার্ট চলাফেরা। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল নৃত্যপর দুলিয়ে উনি একটা গ্লাস বাড়িয়ে ধরলেন সুব্রতর দিকে। মুখে টেপা হাসি। চকিতে চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, সো অ্যাজ এ প্রাইম মুভার আই মাস্ট অফার ইউ দি কোল্ডেস্ট গ্লাস।

হাসির কিছু ছিল না তবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সকলে। অস্বস্তি কাটাতে সেই হাস্যপ্রবাহে গলা মেলাল সুব্রত। আলাপ করিয়ে দিলেন মিঃ রায়। মিসেস দত্তগুপ্ত। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অবাঙালি মিসেস। নবনীতার জন্য বেশ গর্ব ছিল সুব্রতর। মিসেস দত্তগুপ্তের চোস্ত ইংরাজী আর আদবকায়দা দেখে সুব্রত আরো ভাল করে বুঝল যে, নবনীতা সমেত তার তাবৎ সম্পত্তি কোনোদিনই এদের ধারেকাছেও যেতে পারবে না।

উনি চলে গেলে একদম কোণের দিকে একটা জায়গা বেছে বসে পড়ল সুব্রত। প্রশস্ত ঘর। সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত নেমে-আসা ভারী পর্দা। ওপরে আলোর ঝাড়। বাংলা সিনেমায় দেখা সেই জমিদার বাড়ির গানের আসর বলে মনে হল। পাশে পারচেজ ম্যানেজার। গলা নামিয়ে সুব্রত জিজ্ঞেস করল, কি একটা মিটিং হবার কথা ছিল না ?

ঠোঁট ওল্টাল পারচেজ ম্যানেজার। লোকটা এমনিতে বেশি কথার মানুষ। মুখ আলগা। তবু কেমন যেন থুম মেরে আছে। ইতস্তত করে সুব্রত আবার বলল, মিটিংটা অফিসে করল না কেন ?

—খেপেছেন না কি ? খবর জানেন না ? ওরা কেয়ারটেকারের হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়েছে। চার-পাঁচশো এমপ্লয়ী স্টে করছে। এখন ওই বোর্ডরুমে বসে মিটিং করছে জয়ন্ত বিশ্বাসের দলবল। হুঁঃ, একবার পেলে সবকটার চামড়া খুলে নিত মশাই।

মৃদু প্রতিবাদ করে সুব্রত, না-না, পুলিস হেল্প নিয়ে যদি ঢোকা যেত।

—হেল ইওর পুলিস। পুলিস দিয়ে ম্যাক্সিমাম অফিসটা সামলাবেন। তারপর ? বাড়ি ঢুকতে হবে তো ? বাজার, ছেলের স্কুল, লোকাল এরিয়া—সেখানে পুলিস কোথায় পাবেন ? বউ মেয়ের পেছনে গুন্ডা লেলিয়ে দেবে। তার চেয়ে এই ভাল। কতদিন আন্দোলন করবে—একমাস, দুমাস। তারপর ? মাস মিডিয়াগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। দেখবেন মনোবল চুপসে গেছে। পাবলিক খিস্তি করছে। তারপর একদিন সুড়সুড় করে সাবমিট করবে বাছাধনরা।

চকচক করছে পারচেজ ম্যানেজারের চোখ। যেন আন্দোলনের শেষ দিনটিকে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন উনি। সুব্রতর কাছেও পরিকল্পনাটা খারাপ লাগল না। এরকম হলে গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগিয়ে নিজের মাঝামাঝি অস্তিত্বটুকু বেশ বজায় রাখা যাবে।

চারপাশে চোখ বোলাল সুব্রত। খোশ গল্পগুজব চলছে। রিভিসন অফ পে স্কেল, ইনকাম ট্যাক্স, সল্ট লেক ইত্যাদি প্রভৃতি। সকলেই নিঃশঙ্কচিত্ত। আয়না থাকলে একবার নিজেকে দেখে নিত। অবশ্য না দেখেও নিজের ফ্যাকাসে অস্তিত্বটুকু আঁচ করতে পারছিল। জিভটা বিস্বাদ লাগছে। মনে হল যেন নিষিদ্ধ কোনো কিছুর সঙ্গে অযাচিতভাবে জড়িয়ে পড়েছে সে। অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। বা অপরাধ নয় আসলে একটা ভয় ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। এখনই যদি অনেকদূরে চলে যাওয়া যেত। নবনীতা আর জুন্টাকে নিয়ে কোনো নির্জন স্থানে। অথচ তাও হবার নয়। নবনীতার সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থলটিও আজ সুব্রতর কাছে এতটুকু সুরক্ষিত নয়। নবনীতা নিজের থেকেই সব ঠিক করছে। আর সেই প্রবাহিত ঘটনাস্রোতের মধ্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভেসে যেতে হয়েছে তাকে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। মাঝের মানুষরা এমনি করেই অর্থহীন অস্তিত্ব আঁকড়ে বেঁচে থাকে। নিজের অক্ষমতায় আর আক্ষেপে চোখমুখ কুঁচকে উঠল সুব্রতর।

পি· আর· ও· মিঃ রায় বাইরে গিয়েছিলেন। সহসা ঘরে ঢুকে ঘোষণার মতো টেনে টেনে বললেন, শুনুন, আমরা খবর পেলাম ওরা নাকি মিছিল করে যে কোনো সময়েই এখানে এসে পড়তে পারে। এম· ডি চান না যে, ওরা এসে আমাদের সকলকে একজায়গায় দেখুক। সুতরাং আপনারা যে যার বাড়িতে ফিরে যান একসেপ্ট মিঃ সুব্রত নিয়োগী। নিয়োগী, আমরা প্রেসের লোকেদের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ব্যবস্থা করেছি। একটা নাগাদ শুরু হবে। আপনাকে একটু থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে।

সকলে উঠে পড়ল। জুতোর খসখস। ওরা পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেই বিশাল ঘরের মধ্যে একদম কোণের চেয়ারে একা বসে থাকল সুব্রত। পাখার সোঁ-সোঁ শব্দ। ইচ্ছে করছিল ছুটে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে। কাঁধ ও কোমরের কাছে টনটন করছে। সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল সুব্রত। মিঃ রায় আর পার্সোনাল ম্যানেজার ফিরে এলেন। পি· এম ডাকলেন, নিয়োগী, এদিকটায় এসে বসুন। ফাইন হাওয়া পাবেন।

অস্ফুটস্বরে সুব্রত উত্তর দিল, ঠিক আছে।

মিঃ রায় পাশে এসে বসলেন। কয়েকটা সাইক্লোস্টাইলড্ কাগজ দিয়ে বললেন, এগুলো পড়ে নিন। প্রেস ব্রিফিং-এর জন্য রাতারাতি তৈরি করতে হয়েছে। তাড়াতাড়িতে কয়েকটা মেজর স্পেলিং মিসটেক রয়ে গেছে। জাস্ট একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

—আমার কি পড়ার দরকার আছে ? মানে, আমাকে কি কিছু বলতে হবে স্যার ?

অসহায় সুব্রতর দিকে তাকিয়ে মিঃ রায় হেসে উঠলেন। তারপর ওর পিঠে স্নেহের চাপড় মেরে বললেন, আরে, এত নার্ভাস হবার কি আছে ? চিয়ার আপ নিয়োগী। সিক্সটি সেভেনে ঠিক সিমিলার অবস্থা। তখন তো একটাই ইউনিয়ন। আমি সবে জয়েন করেছি। রেগুলার বাড়ি এসে হুমকি দিচ্ছে। অনলি ফাইভ ডেজ। সিক্সথ ডেতে স্ট্রাইক ভেঙে গেল ওদের ওপর থেকে যতটা সলিড মনে হয় আসলে ততটা নয়। ভেতরে ফাঁপা। আই'ম সিওর যে এইচ· ও-তে যারা অবস্থান করছে তাদের অনেকের পকেটেই ম্যাটিনি শো-এর টিকিট পাওয়া যাবে।

—দ্যাটস রাইট। আম্পায়ারের ভঙ্গিতে হাত তুলে পি· আর· ওকে সমর্থন জানালেন পার্সোনাল ম্যানেজার।

ধরা পড়ে গেছে সুব্রত। তবু একটু হেসে নিজেকে শুধরে নিতে চেষ্টা করল। যে করেই হোক এই ভেঙে পড়া অবস্থাটা কাটাতে হবে উঠে পড়লেন মিঃ রায়। বললেন, প্রেসকে মিট করবেন এম· ডি। আমরা সঙ্গে থাকব আর কি। যদি সিক্সটিস্থ ডিসেম্বরের কথা ওঠে তাহলে আপনাকে দরকার লাগবে। জাস্ট ফর এ ফিডব্যাক। ও· কে ? দেখি, আমাকে আবার পুলিস অ্যারেঞ্জমেন্টটা করতে হবে। শোনা যাচ্ছে, ওরা নাকি মিছিল স্টার্ট করে দিয়েছে।

পুলিস আর মিছিলের প্রসঙ্গে চমকে উঠল সুব্রত। কানে ভেসে এল অসংখ্য মানুষের স্লোগান আর লাঠি, গ্যাস, গুলির শব্দ। চোখ বুজে নিজেকে স্থির করল। সিগারেট ধরাল কাঁপা হাতে। প্লাস্টিক ফোল্ডার থেকে প্রেস স্টেটমেন্টগুলো বার করল। প্রথম কয়েকলাইন পড়ার চেষ্টা করল। কিছুই মাথায় ঢুকছে না। মন চলে যাচ্ছে বাইরের দিকে। যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে সেই মিছিল। অসংখ্য মানুষের মিছিল। ওরা আঙুল তুলে বলবে, ওই দেখ। দালালের বাচ্চাটা ঠিক রয়েছে এখানে।

একভাবে বসে থাকতে অসহ্য লাগছে। উঠে পড়ল সুব্রত। একবার বাথরুম ঘুরে আসা দরকার। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। কেউ নেই। বাড়িতে অন্য কোনো প্রাণী আছে বলে মনে হল না। ঘরে ফিরে এল। আবার পড়ার চেষ্টা করল প্রেস স্টেটমেন্ট। শুধুই কালো কালো অক্ষর। জোর করে মন বসাল। কোনোরকমে একপাতা পড়ে রেখে দিল টেবিলে। চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। ঘুম জড়িয়ে আসছে দুচোখে। প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করল। ঘড়ি দেখল কয়েকবার।

মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ।

বুটের খটখট আওয়াজ। প্রতিটি শব্দে কান পাতছিল সুব্রত। আর বাইরের ব্যস্ততাটুকু উপলব্ধি করে প্রতিবারই মনে হচ্ছিল হয়তো এখনই শুনতে পাবে সেই সমবেত স্লোগান। তবু স্থির বসে থাকল সে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতে চায় সে। শুধু এইরকম প্রতীক্ষা আর আতঙ্কের মধ্যে যে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানো যায় জানত না সুব্রত। সত্যিই একসময় একটা বাজল। একজন বেয়ারা একবাক্স খাবার আর জল রেখে গেল। সামান্য পরে মিঃ রায় এসে বললেন, আরে কি ব্যাপার—শুরু করে দিন। কাছাকাছি ওই পাওয়া গেল। মিক্সড় ফ্রায়েডরাইস। নিন।

সুব্রত বলল, একবার টয়লেটটা—।

—আসুন, আসুন। বারান্দার অপর প্রান্তে টয়লেট। মিঃ রায় দেখিয়ে দিল সুব্রতকে। বারান্দা পেরিয়ে যাবার সময় সুব্রত দেখল পাশের ঘরেই বেশ কয়েকজন লোক। চাপা হাসির শব্দ। ফেরার পথে ভাল করে লক্ষ্য করল আবার। এম· ডির স্ত্রী খাবার পরিবেশন করছেন। বাতাসে খাবারের গন্ধ। গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল সুব্রতর।

বমি চেপে ঘরে ফিরে এল। খাবারের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কয়েকবার নাড়াচড়া করল। একদম ইচ্ছে নেই। মিঃ রায় এলেন। পাশের চেয়ারে বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে একটা ফাইল ওন্টাতে ওন্টাতে বললেন, সব এসে গেছে। এবার স্টার্ট করব।

সুব্রত তাকাল। মুখের খাবারটুকু গিলে বলল, আমি কি যাব?

—না। এম· ডি বলেছেন নর্মালি আপনার দরকার হবে না। প্রয়োজন হলে ডাকব। আপনি এখানে ওয়েট করুন।

একটু পরে উঠে গেলেন মিঃ রায়। আবার একা হয়ে গেল সুব্রত। অর্ধেক খেয়ে রেখে দিল বাক্সটা। পাশের ঘরে হাসির উচ্চস্বর। মনে মনে একটা গালাগাল দিল। অসহ্য লাগছে এই প্রতীক্ষা। ঘড়ি দেখল। ঠিক দুটো দশ। ডাঃ মুখার্জি তিনটের সময় শুরু করবেন। নবনীতা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পৌঁছে গেছে সেখানে। এটাও সে চায়নি। বিচলিত বোধ করল সুব্রত। কিছুই চায়নি সে। ইউনিয়ন আর ম্যানেজমেন্ট এই যুগ্ম অসততার মাঝখানে শুধুই দর্শক হতে চেয়েছিল সে। পারল না। সস্তা ইউনিয়নবাজি আর অকর্মণ্য পঙ্গু কর্তৃপক্ষকে সমানভাবে ঘৃণা করতে চেয়েছিল সে। অথচ সেই কর্তৃপক্ষের মর্জিমত একটার পর একটা হুকুম তামিল করে যেতে হচ্ছে। উঠে দাঁড়াল সুব্রত। নিজে নয়, কে যেন ঠেলে তুলে দিল তাকে। এখনই যেতে হবে নার্সিংহোমে। এখনও সময় আছে। যদি শেষ মুহূর্তে নবনীতাকে ফেরানো যায়। এরা যাবার অনুমতি না দিলে অগ্রাহ্য করে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ, এইভাবে বসিয়ে রাখার কোনো অধিকার ওদের নেই।

পাশের ঘরে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল সুব্রত। এম· ডির গলা শোনা যাচ্ছে। কিছু একটা পাঠ করে শোনাচ্ছেন। ওপ্রান্তের টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন জি· এম। সুব্রতকে উপেক্ষা করেই ঢুকে যাচ্ছিলেন পাশের ঘরে। সুব্রত বলল, স্যার। একটা জরুরী কাজ ছিল স্যার। আমাকে কি আর থাকতে হবে?

চোখ কুঁচকে তাকালেন জি· এম। তারপর চাপা স্বরে জবাব দিলেন, নাথিং ইজ মোর আর্জেন্ট রাইট নাউ। প্লিজ ওয়েট।

সুব্রত প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। পারল না। জি· এম চলে গেলেন ঘরের ভেতর। নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে উঠল সে। না, শুধু আজ্ঞাপালন ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। পায়ে পায়ে ফিরে এল সুব্রত। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। ভারী হয়ে আসছে গলার কাছে। যন্ত্রণায় বিকৃত হল তার সুন্দর মুখমন্ডল। ঝুপ করে বসে পড়ল নির্দিষ্ট চেয়ারে। নিজে নয়, কে যেন ঠেলে বসিয়ে দিল তাকে। আরো কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে শেষপর্যন্ত হয়তো জ্ঞান হারাত সে কিন্তু তার আগেই মিঃ রায় এসে বললেন, ইট'স অলমোস্ট ওভার। জি· এম বললেন আপনি চলে যেতে পারেন।

মিঃ রায়ের কথাগুলি যেন ছুটেআসা লোহার বলের মতো আঘাত করল সুব্রতকে। ছিটকে উঠে পড়ল। রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে তার অভ্যন্তরে। নবনীতাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। রাস্তায় বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। এতটুকু সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। এখনও সময় আছে। ডাঃ মুখার্জি একটু আধটু দেরি করতেই পারেন। অতবড় সার্জেন, তাঁর নানান কাজ থাকাই স্বাভাবিক। তিনটের জায়গায় চারটে হতেই পারে। সুব্রত ড্রাইভারের কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, সর্দারজী—জরা তেজসে চালাইয়ে। ধরমতলা স্ট্রিট। কুইক।

ফাঁকা রাস্তায় হু হু করে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। অপমানে লাল হয়ে উঠেছে সুব্রত। সামান্যতম প্রতিবাদ পর্যন্ত করা গেল না। অথচ বিশেষ কিছুই নয়, দরকার ছিল যৎসামান্য সাহস। অক্ষমতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করল। বিড়বিড় করে বলল, কাপুরুষ কোথাকার। এর আগেও সে পারেনি। বহুবার। আর প্রত্যেকবারই না পারার জন্য একটা না একটা অজুহাত তৈরি করেছে। এইভাবেই ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে সে। তার মতো আরো অনেক মানুষ। অদৃশ্য শেকলে বেঁধেছে নিজের হাত, পা, কোমর। যেন সেই বাঁধনের জ্বালায় ছটফট করে উঠল সুব্রত। সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, আউর স্পিড বাড়াইয়ে—হারি আপ।

ওয়েলিংটনের মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সি। সামনে বিরাট মিছিল। সরকারি ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে গ্রামের মানুষের মিছিল। মোড়ের ওধারে গলির মধ্যে ডাঃ মুখার্জির নাসিংহোম। অজস্র ভীড়। মিছিলের দুপাশে মানুষের জটলা। উষ্ণ স্লোগান। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ভিড়ের মধ্য দিয়ে গলে যেতে থাকল সুব্রত। প্রতিটি সেকেন্ডের দাম আছে। মিছিলের ওপারে যেতে হবে। সুব্রত থমকে দাঁড়াল। তারপর ঢুকে পড়ল মিছিলের মধ্যে। ছন্দময় স্লোগান। তালে তালে কোরাস। দ্বিতীয় লাইন ভেদ করার ফাঁক খুঁজল। হাতে হাতে ধরা। আর সময় নেই। দুটো সরলগোছের মানুষের মাঝ দিয়ে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেল সুব্রত। হৈহৈ চিৎকার। দু একটা নরম গালাগাল। কোনোদিকে দেখার সময় নেই। ছুটে চলল সামনের দিকে।

দোতলার ওপর নার্সিংহোম। সিঁড়ির মুখে এসে হাঁফ ধরে গেল সুব্রতর। আর শক্তি নেই। বুকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পেটের ডানদিকে খিচ ব্যথা। সিঁড়ির হাতল ধরে কোনোমতে ওপরে উঠল। সামনেই অফিস-রুম। রুমে পা দিতেই ডাঃ মুখার্জি স্বভাবসিদ্ধ উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, এই যে। যাক্ তাহলে হাজতবাসটা উদ্ধার হল। আরে মশাই মিস্টারের পারমিশন ছাড়া কি মিসেসের অ্যাবরশন হয়?

হাঁফাচ্ছিল সুব্রত। পা কাঁপছে। জিজ্ঞেস করল, হয়ে গেছে?

—জাস্ট কমপ্লিটেড। দেখা করুন। রুম নম্বর সিক্স। যাবার সময় কনসেন্ট ফর্মে দস্তখত করে যাবেন। নইলে ডাক্তারের হাতে হ্যান্ডকাপ।

টলতে টলতে ছ'নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ঝাপসা দেখছে সবকিছু। সাদা বিছানায় শুয়ে আছে নবনীতা। চোখ বন্ধ। নবনীতাকে ডাকতে গিয়ে সহসা-উঠে-আসা কান্নাপ্রবাহে কণ্ঠ জড়িয়ে গেল সুব্রতর। বের হল জান্তব এক শব্দ। চমকে তাকাল নবনীতা। দুহাতে চোখ ঢেকে সুব্রত মুখ ঘুরিয়ে নিল দ্রুত। অসুস্থ নবনীতা অদ্ভুত চোখে দেখল সুব্রতকে। দুর্বলকণ্ঠে বলল, কী হয়েছে?

নিজেকে সংযত করল সুব্রত। চোখ মুছে নিল রুমালে। সামনের চেয়ারে বসে তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে। নবনীতা একই ভাবে লক্ষ্য করছিল সুব্রতকে। একটু পরে বলল, সিন ক্রিয়েট করছ কেন? তোমার মত নিয়েই তো সব হয়েছে।

ক্রুদ্ধ নবনীতা মাথা ঘোরাল দেয়ালের দিকে। বড় করে শ্বাস নিল সুব্রত। ঝুলে-থাকা লিফটের সেই দমবন্ধ করা স্মৃতি মনে পড়ল। মাঝের মানুষদের এইভাবেই ঝুলে থাকতে হয়।

বাইরে জুতোর শব্দ। নার্স। কাগজ আর পেন বাড়িয়ে দিল সুব্রতর দিকে। কনসেন্ট লেটার। সই করল সুব্রত। মনে পড়ল কমিশনের শেষ দিনে এইভাবেই তার বিবৃতিগুলোতে সই করতে বলেছিলেন মিঃ গুপ্তা। জলে ঝাপসা হয়ে আসছে দুচোখ। নার্সের সামনেই সুব্রতর গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এল। আর সামলাতে পারল না নিজেকে।

সমাপ্ত

ছবি : শ্রী সান্তো

"আমাদের চায়না ইয়র্ঝুতে
পুণর্জন্ম লাভ করেছে–
ফরাসী ঐতিহ্যের নিদর্শন,
সবার প্রিয় শিনন!"



রূপচর্চা

চোখ

চোখের দীর্ঘস্থায়ী মনভোলানো সৌন্দর্য নির্ভর করছে প্রধানত সামগ্রিক স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা ও ঘুমের অভ্যাসের ওপর।

আপনার মুখমন্ডলের সৌন্দর্য, ত্বকের উজ্জ্বলতা, চুলের সজীব চাকচিক্য, শরীরের রমণীয় গঠন ও বাঁধুনি প্রভৃতির যতই আকর্ষণ থাক, শেষপর্যন্ত আপনার দুটি চোখের প্রাণময় ঝকমকে আলোর ঝলক, ইংরিজিতে যাকে বলে sparkling এবং তার ভাব ও ভাষাই আপনার আসল পরিচয়কে মেলে ধরে। এই চোখের ভাষাতেই আপনি সবচেয়ে সুন্দর কথা বলেন, যা আসলে আশ্চর্য এক নীরব বার্তা এবং নীরব হয়েও যে বার্তা সবচেয়ে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে হৃদয়ের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে সক্ষম। অন্তরে ও বাইরে আপনি প্রকৃতই কতটা সুন্দর তা আপনার চোখদুটোই সবচেয়ে ভালোভাবে বলে দেয়। আপনার আকর্ষণে যে একেবারে আপনার কাছে আসে সেও আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই কথা বলতে ভালোবাসে, অন্য কোনোদিকে নয়। সহজ কথায়, মনের সমস্ত ভাব ও ভাষা চলমান ছবির মতো প্রতিমুহূর্তে আপনার চোখে প্রতিফলিত হয়ে অন্যের চোখে ধরা পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে॥'

অথবা অরুণকুমার সরকারের আধুনিক কবিতার সেই স্মরণীয় কয়েকটি লাইন :

'সিন্দুক নেই ; স্বর্ণ আনিনি,
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাবো কি পরশ যৎসামান্য ?'

মসৃণ ত্বক, একরাশ ঘন নরম চুল, উজ্জ্বল প্রস্ফুটিত ওষ্ঠ বা সুডৌল শরীর যা-ই আপনার থাক, চোখের ঝকঝকে দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেলে আপনাকে অবশ্যই প্রাণহীন ও বিষণ্ণ মনে হবে। শুধু তা-ই নয়, যে-কোনো রকম চোখের প্রসাধন-সামগ্রী আপনি যতই পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করুন, ক্লান্ত, পীড়িত ও অনুজ্জ্বল চোখের চেহারাকে আড়াল করতে ব্যর্থ হবেন। মূল্যবান ও চমকপ্রদ কার্যকারিতায় সমৃদ্ধ নানাবিধ প্রসাধন-সামগ্রী দ্বারা যদিও বা কোনো সন্ধ্যায় আপনি আপনার ক্লান্ত ও ম্লান চোখদুটো মনোমুগ্ধকর করে তুলতে সক্ষম হন তবে তা-ও হবে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ; এমনকি পুরো সন্ধ্যাটিও আপনি সগৌরবে অতিক্রম করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু যা-ই আপনি করুন আপনার চোখের প্রাথমিক সাবধানতা বিষয়ে কয়েকটি জরুরি কথা আপনার মনে রাখা দরকার। পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকদিন ধরেই যদি আপনি চোখের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হতে থাকেন, চোখদুটোতে জেগে থাকে বৃত্তাকার লাল আভা, মাঝে মাঝেই চোখের ধারগুলো ভরে উঠতে চায় জলের রেখায়, কিংবা আপনি যদি সচেতন ভাবে অনুভব করেন চোখদুটো পিটপিট করছে অনবরত, অথবা ভ্রুকুটিত হতে থাকছে অনাবশ্যক ভাবে কিংবা মাথা ধরছে মাঝে মাঝেই তাহলে অবশ্যই সচেতন ও সাবধান হবেন। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে এক্ষেত্রে ব্যথা-উপশমকারী কোনো সাধারণ অ্যাসপিরিন জাতীয় বড়ি খেয়ে দেখতে পারেন। অথবা বিশেষভাবে আইপ্যাড-এর প্রয়োগ করতে পারেন। এক টুকরো তুলো উইচ হ্যাজেল বা সরাসরি একেবারে ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে, চুপচাপ চিত হয়ে শুয়ে দু-চোখের পাতায় বিছিয়ে দেবেন। আরো ভালো হয় যদি চায়ের চামচের এক চামচ বোরিক অ্যাসিড এক গেলাস পরিমাণ ঠান্ডা জলে গুলে লোশনটা তৈরি করে নিয়ে একই ভাবে প্রয়োগ করেন এই ভাবে ভেজা তুলোর আচ্ছাদন চোখের পাতায় অন্তত পনেরো মিনিট রাখবেন। কয়েকদিন পর পর অভ্যাস করার পরও যদি বিশেষ কোনো উপকার না পান তবে অবশ্যই চোখের ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

চোখের যে-কোনো রকম ক্লান্তি, অবসন্নতা এবং অতিরিক্ত চোখের পরিশ্রমজনিত ব্যথা-বেদনা দূর করার প্রধানতম উপায় হলো ছেদহীন পর্যাপ্ত ও সুষ্ঠু ঘুম। বাধাহীন যথাযথ ঘুম এমনিতেই মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, চোখের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত ভাবে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এই নিয়ম-নীতি পালনে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করতে গিয়ে নিজেকে গৃহবন্দী করে তুলবেন না। অর্থাৎ শয্যাগ্রহণের নিয়মানুবর্তিতার তাগিদে রাত্রির অবসর- বিনোদনগুলোর আনন্দ থেকে সব সময় নিজেকে দূরে রেখে অথবা অধিক রাতের ঝলমলে সব পার্টির আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নিজের চারপাশে একটা নিরানন্দ ও কঠোর পরিমন্ডল গড়ে তুলে রূপ ও সৌন্দর্যের সাধনা করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, যদি আপনি রাত্রের মিলনমেলায় সদাসর্বদা অংশ নিতে যান এবং সেই পার্টির বাধাবন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের শেষে চার-পাঁচ ঘন্টার বেশি যথাযথ ঘুমের অবকাশ না পান তবে অচিরেই আপনার চোখদুটোয় তার অবাঞ্ছিত ছাপ ফুটে উঠবে। আপনি যদি কিশোরী বা পরিপূর্ণ যুবতী হন এবং স্বাস্থ্য হয় স্বাভাবিক তাহলে হয়তো অবসাদ ও অনুজ্জ্বলতার এই ছাপ ফুটে উঠতে কিছু সময় লাগবে কিন্তু তার অধিক বয়সীদের চোখের সৌন্দর্যের দ্রুত অবলুপ্তি ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। আর তখন, যতই আপনি পর্যাপ্ত মাসকারা বা আই-শ্যাডো ব্যবহার করুন আপনার দুটো চোখের সৌন্দর্যহীন নির্জীব চেহারাকে আড়াল করতে ব্যর্থ হবেন। সুতরাং আপনার ক্ষেত্রে সেরকম সম্ভাবনা দেখা দিলেই আপনি অবশ্যই অন্তত সাময়িক ভাবে আপনার অধিক রাতের আনন্দাভিসার বন্ধ রাখবেন।

এছাড়াও যদি আপনি সুষম খাদ্য তালিকায় নিজেকে সদাসর্বদা আবদ্ধ রাখেন এবং নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমে অভ্যস্ত হন তবুও আপনার চোখের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ কখনোই যথেষ্ট মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠবে না যদি আপনার চশমার দরকার থাকে অথচ আপনি কাল্পনিক সৌন্দর্যহানির কথা ভেবে চশমা ছাড়াই চলতে চান। সমস্ত পৃথিবীর মেয়েদের মধ্যেই চশমা সম্পর্কে এক প্রবল অনীহা আছে। কিন্তু মনে রাখবেন নিছক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে যে অস্বস্তি আপনি স্বীকার করে নেবেন তা আপনার অজান্তে একটা অসুন্দর অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতির ছাপ আপনার চেহারায় ফুটিয়ে তুলবে। মেয়েরা সাধারণত চশমা ব্যবহারে এতদূর অনিচ্ছুক যে, তাঁরা মনে করেন, কিঞ্চিৎ ক্ষীণদৃষ্টি থেকে উকিঝুঁকি মারা বা বক্রদৃষ্টিতে তাকানো বরং অনেক ভালো। এটা অত্যন্ত অসঙ্গত ধারণা এবং রূপ সম্পর্কে এক ধরনের অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়। বলাবাহুল্য এর ফলে ভবিষ্যতে আরো ক্ষতি স্বীকার করতে হতে পারে।

চিত্ররথ দত্ত

প্রশ্ন : আমি মেশিনে উলের কাজ শিখতে চাই। কোন্ উপায়ে কোথায় এই কাজ শেখা যায় ?

উত্তর মেয়েদের সেলাই, বোনা, হাতের কাজ শেখার নানা কেন্দ্র আছে কলকাতায় বা তার উপকণ্ঠে। সুদূর গ্রামে থেকে আপনি যে উপার্জনে স্বয়ম্ভর হতে চাইছেন, এটা খুবই প্রশংসনীয়। মেয়েরা স্বাবলম্বী হতে পারলে সমাজের বহু সমস্যার নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব। আপনাকে একটি সংস্থার খবর দিচ্ছি,—ক্যালকাটা স্টাডি সার্কল, ২৬ এ, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলকাতা ১২। এখানে রিপ্লাই কার্ডে চিঠি লিখে দেখুন।

প্রশ্ন : যাঁরা বিজ্ঞাপন তৈরি করেন, তাঁদের নিত্য নতুন সুন্দর মুখের দরকার হয়, পড়লাম। এরকম কোনো প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা যদি জানান, চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর — সব বিজ্ঞাপন সংস্থাই পণ্যপ্রচারের প্রয়োজনে সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুশ্রী মুখের মডেলের সাহায্য নেন। শালীনতা বজায় থাকলে একাজে কোনো অসম্মান নেই। আপনি খবরের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দিকে লক্ষ রাখুন, প্রায়ই এরা আবেদনপত্র আহ্বান করে।

প্রশ্ন ঃ আমি আপনাদের সুকন্যা পত্রিকা মারফৎ বিভিন্ন মহলের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার প্রকাশে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, আমাকে কি কি করতে হবে জানালে বাধিত হব।—নূপুর চ্যাটার্জি, বাগবাজার।

উত্তর ঃ আপনি লিখেছেন, আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার (এবং হয় তো লেখারও) পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কোন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার প্রকাশ করতে চান, তা-ও জানাননি। তাই আপনাকে বলি, একটি লেখার নমুনা সঙ্গে নিয়ে পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে এসে কথা বলুন। লেখার মান উপযুক্ত হলে সকলের লেখাই সুকন্যায় ছাপা হতে পারে। এ-ব্যাপারে লেখাই বিবেচ্য, লেখকের কৌলীন্য নয়।

প্রশ্ন ঃ বি-এ পাশ করে বসে আছি। শহরে গিয়ে যোগাযোগ করা বা শেখার মত আর্থিক সঙ্গতি তো চাই। অনুরোধ করব, কম খরচে বা গ্রামের মেয়েদের শেখার উপযোগী কী শেখা যেতে পারে জানাবেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা। খেলাধূলা বা সেলাই শেখার খুব ইচ্ছা। মেশিনে উল বোনা শেখার জন্য কোথায় ব্যবস্থা আছে জানাবেন।—পুষ্প পাত্র, সুন্দর বন।

উত্তর ঃ আপনার মত আর একজন মহিলার এরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে একটি সংস্থার ঠিকানা জানিয়েছি। তবে একথা সত্যি, সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রাম থেকে কলকাতায়



নিয়মিত এসে কিছু শেখা যেমন অসুবিধের, তেমনই ব্যয়সাধ্যও বটে। আপনারা কয়েকজন মহিলা উদ্যোগী হয়ে একটি সমবায় সংস্থা গড়ে তুলুন না। সেখানে গ্রামের মেয়েরা কুটিরশিল্পের চর্চা ও অনুশীলন করবে। যে যা জানে, তাই দিয়ে শুরু হবে। সেলাই ও বোনার কাজ, হাতের কাজ (কর্মশিক্ষায় সাধারণ ভাবে যা শেখানো হয়, তার সঙ্গে আরও একটু কল্পনা ও বুদ্ধি খাটিয়ে), দড়ি, পাট, ও বাঁশের কাজ—এ-সবের কিছু কিছু নিদর্শন তৈরি হলে প্রথমে আঞ্চলিক প্রদর্শনী করে ও যথাসম্ভব প্রচারের মাধ্যমে অঞ্চলের সবাইকে উৎসাহিত করুন, কিছু বিক্রি হলেও তা আপনাদের পরবর্তী কাজে প্রেরণা দেবে। তারপর সংগঠিত কাজের মাধ্যমে আপনাদের নানা সমাজকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে পরিচয় হবে, অর্থ সাহায্যও উপযুক্ত স্থলে পাওয়া সম্ভব। যোধপুর পার্কের নারীসেবা সংঘ বা বালিগঞ্জ স্টেশনের লাগোয়া সরোজনলিনী সমাজকল্যাণ সমিতির কাজ একদিন এসে দেখে যেতে পারেন। এগুলি বহু পুরোনো সংস্থা, ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। খেলাধুলোর ব্যবস্থাও এভাবেই সংগঠিত চেষ্টায় গড়ে তোলা যায়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি, দৃঢ় সংকল্প ও ঠিক পথে পরিচালিত পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। সাফল্য আসবেই।

প্রশ্ন ঃ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে সুকন্যাতে একটা উলের ডিজাইন দেবার। দয়া করে আমার ইচ্ছাকে সফল ('ইচ্ছাকে সাফল্য করলে'নয় এবং 'ইন্দীরা'-ও নয়, ইন্দিরা) করলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।—শর্মিষ্ঠা পাত্র, বাঁকুড়া।

উত্তর ঃ আপনি একটা ডিজাইনের সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে পাঠান। ছবি তো দরকার হয়ই। তবে সেলাই বিভাগের যিনি ভারপ্রাপ্ত, এ বিষয়ে তাঁর বিচারের ওপরেই আপনাকে নির্ভর করে থাকতে হবে।

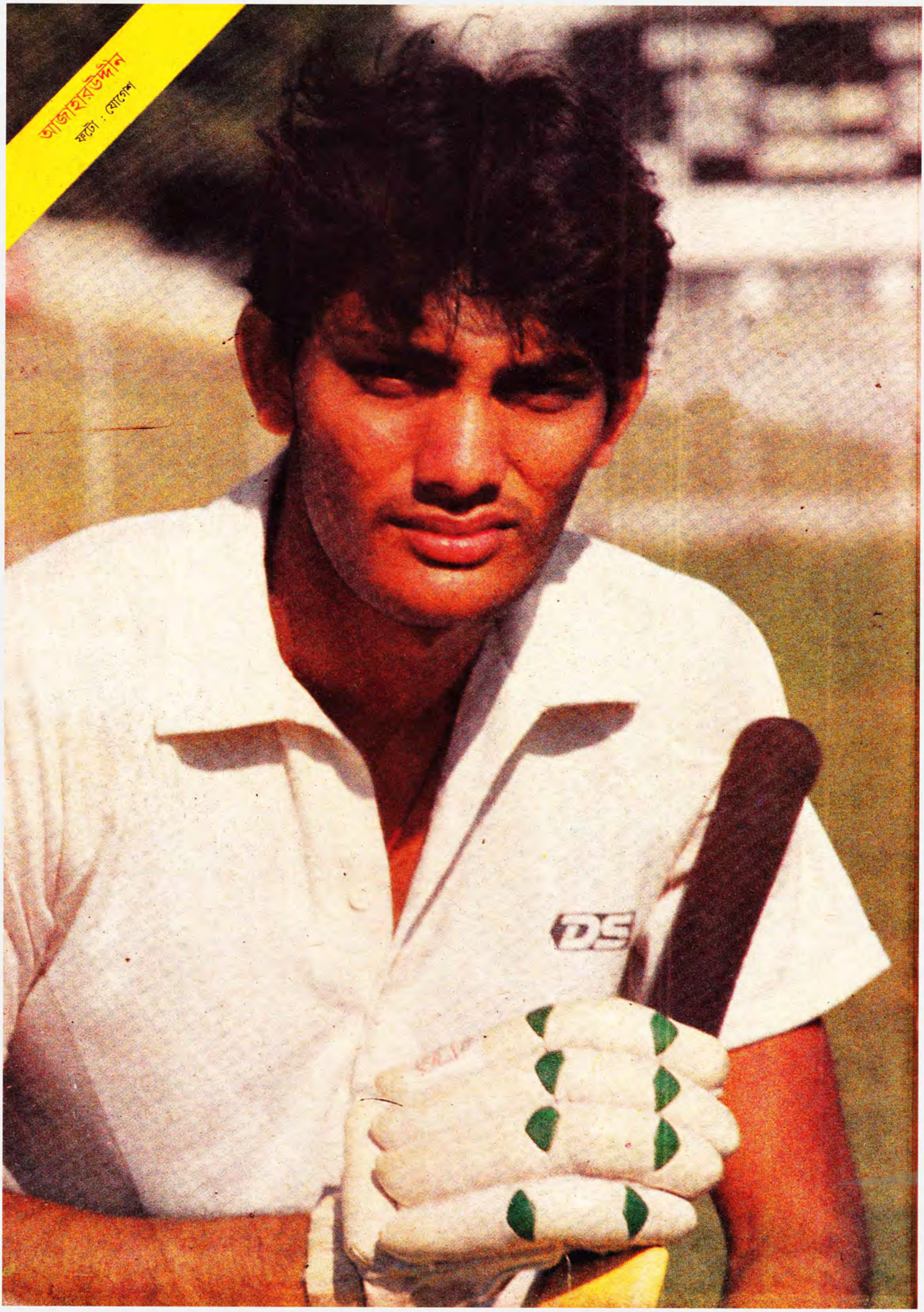
প্রশ্ন ঃ আমি সুকন্যার একজন পাঠিকা। আমি এবং আমার বান্ধবীদের কয়েকটি অসুবিধা জানাচ্ছি, দয়া করে সমাধানের উপায় জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনার চিঠির শেষে আপনার নাম নেই, ঠিকানা নেই। চিঠির ভেতরে চারটি নাম দিয়ে পাঁচটি প্রশ্ন করেছেন, কেন বলুন তো? পত্রিকা দপ্তরে এমন চিঠিকে গ্রাহ্য করা হয় না। পাঁচটি প্রশ্ন আপনার চিঠিতে—আপনার মাথাধরা বান্ধবীর 'হাত-পায়ের' লোম; বউদির 'নোখ সেফ' করার মেশিন ও শীতকালে বাইরে যাবার সময় পাউডার ব্যবহার; মামাতো বোনের গাল বসে যাওয়া এবং—০—এই চিহ্নের পরে আবার, "টি·ভি·তে সংবাদ পাঠকের চাকরি পেতে হলে কী যোগ্যতা থাকা দরকার তা অবশ্যই জানাবেন।" এবারে আপনি ভেবে দেখুন তো—সব প্রশ্নগুলো আপনারই একার কিনা ? যদি হয়ও, তাতে সংকোচের কোনই কারণ নেই। শুধু মনে রাখবেন, সব প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব না। কাগজে জায়গার একটা সমস্যা যেমন থাকে, তেমন যা-তা করে একটু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে দিলে সমস্যার সমাধানও হয় না—কারণ তাহলে প্রশ্নগুলির উপর সুবিচার করা হয় না। তাই আপনার নিজের প্রশ্নদুটিরই আমি উত্তর দিচ্ছি আপাতত। (সুইটি রায়, দুর্গাপুর) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলে আপনার মাথাধরা নিশ্চয়ই কমেছে, না হলে চশমা ব্যবহার করা ছাড়তে পারতেন না। 'চোখের কোল বসে যাচ্ছে'—এ সমস্যা চশমা পরলে একটু আধটু হয় সকলেরই। আপনি যে দু-বছর চশমা ব্যবহার করেছেন, তখন আপনি কি এটা লক্ষ্য করেননি ? অথবা, চশমা আপনার নাক ও কানের অনুপাতে 'ফিট' করেছিল কি ? সাধারণত চশমার আকৃতি ও ব্যবহারের গোলমালেই চোখের কোল বসে যায় বেশি। আপনি ভেবে বার করুন কবে থেকে এটা লক্ষ্য করেছেন এবং আপনার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ সর্বাগ্রে জেনে নিন। দু নম্বর, টিভি। আপনি টিভি সেন্টারেই প্রশ্ন রাখবেন, কারণ টি ভি সেন্টারের সঙ্গে সুকন্যার কোন চ্যানেলেই যোগাযোগের দূরতম সম্ভবনাও নেই।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স কুড়ি। আমার মুখে ব্রণ বেরিয়েছিল, আমি সেগুলি খুঁটে দিই। ফলে গালে কালো কালো দাগের সৃষ্টি হয়েছে। সেই দাগগুলো কিভাবে মেলানো সম্ভব ?—প্রতিমা সেনগুপ্ত, দুর্গাপুর।

উত্তরঃ আপনি কোন স্কিন স্পেশালিস্টকে দিয়ে দেখিয়ে জেনে নিন। আপনার স্কিন ড্রাই, না তৈলাক্ত। মুখে গরম জলের স্টীম নেওয়া দরকার হবে হয় তো। ব্রণ হলে তেল সাবান দুটোই যথাসাধ্য বাদ দেবেন, বিশেষত তেল জাতীয় জিনিস। পেট পরিষ্কার রাখা ও লিভার সুস্থ রাখা জরুরী পরামর্শ। আপাতত সোফ্রামাইসিন লাগিয়ে দেখুন কালো দাগের ওপরে।

রুচি রায়


আজাহারউদ্দীন
ফটো : যোগেশ

আজাহারউদ্দিনঃ আবির্ভাবেই অনবদ্য

অনিরুদ্ধ ঘোষ

অস্ট্রেলিয়ার বিল পন্সফোর্ড ও ডগলাস ওয়াল্টার্স এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যালভিন কালিচরণের (অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই লরেন্স রো প্রথম টেস্টেই দুটি শতরান করেন) পর রেকর্ড বইয়ে নাম উঠল এক নবীন ভারতীয়। এরা সকলেই জীবনের প্রথম দুটি টেস্টে শতরান করার গৌরবের অধিকারী। ২২ বছরের এই ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম মহম্মদ আজাহার-উদ্দিন! ১৯৮৪-৮৫ মরশুমে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্টে তাঁর আবির্ভাব। আর আবির্ভাবেই তিনি কলকাতার ৮০ হাজার দর্শককে উপহার দিলেন অনবদ্য ১১০ রানের একটি ইনিংস। আজাহারউদ্দিন কিন্তু কলকাতার দর্শক-দের খুশি করেই ক্ষান্ত রইলেন না। চতুর্থ টেস্ট মাদ্রাজের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে। সেখানকার হাজার চল্লিশ দর্শককে রাখলেন মন্ত্রমুগ্ধ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম ইনিংসের হিসেবে ইংল্যান্ডের চেয়ে ৩৮০ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত যখন ব্যাট করতে নামে তখন শুরুতেই দেখা দেয় বিপর্যয়। মাত্র ২২ রানে তিনটি উইকেট পড়ে যায়। এরকম অবস্থায় ক্রিজে আসেন মাত্র একটি টেস্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে মহম্মদ আজাহারউদ্দিন। টেকনিক, স্কিল এবং টেম্পারামেন্টে কিন্তু তিনি দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের হার মানান। উপহার দেন ১০৫ রানের একটি ইনিংস। কলকাতায় প্রথম শতরানের থেকে অনেক মাহাত্ম্য পূর্ণ এবং উজ্জ্বল তাঁর এই ইনিংসটি।

কিন্তু এই দুটি ইনিংস, দুটি শতরানও ম্লান হল কানপুরে করা আজাহারের ১২২ রানে। কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন তিন ওভার খেলা চলবার মধ্যেই আজাহার সৃষ্টি করলেন ক্রিকেটের এক বিশ্ব রেকর্ড। জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টে তিনটি সেঞ্চুরি। আর কী অভাবনীয় পরিস্থিতিতে তিনি এই নজির গড়লেন। প্রথম দিন দিনের শেষে ৯৮ রানে অপরাজিত আজাহার। দুটি রান হবে কি হবে না এই অনিশ্চয়তা নিয়ে ২২ বছরের একটি যুবক প্রায় ১৬ ঘন্টা কাটালেন। ভারতবাসী হিসাবে প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমী মানুষের টেনশন যা ছিল – আজাহারের বোধহয় তাও ছিল না। তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ভোরে নিজের জন্য সৃষ্টি করলেন বিশ্বক্রিকেটে এক অনন্য নজির, দেশের জন্য সংগ্রহ করলেন মস্ত এক সম্মান।

অভিষেক ম্যাচে চমক দেওয়ার ব্যাপারটা যেন আজাহারের মজ্জাগত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নক-আউট প্রতিযোগিতা হয়, দলীপ ট্রফি। এক বছর আগে সেই দলীপ ট্রফির খেলা হয় বিহারের অখ্যাত এক শহর জামাডোবায়। মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলের পক্ষে দলীপ ট্রফিতে প্রথম ম্যাচ খেলেন আজাহার। আর করেন ২২৬ রান। তারপর মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি চলে এলেন ভারতীয় টেস্ট দলে।

জামাডোবায় ডাবল সেঞ্চুরি করলেও তখন কিন্তু আজাহারউদ্দিন ছিলেন মূলত লেগসাইড প্লেয়ার। অর্থাৎ প্রবণতা ছিল লেগসাইডে স্ট্রোক করার। অফসাইড স্ট্রোকে তাঁর দক্ষতা তখনও প্রকাশ পায়নি। কিন্তু মাত্র এক বছর পরে কলকাতার মাঠে তাঁর খেলা দেখে সেটা বিশেষ মনে হয়নি। অবশ্য কলকাতায় প্রথম দিন যখন ব্যাট করতে নামেন তখন তাঁকে খুব একটা কনফিডেন্ট মনে হয়নি। হয়তো জীবনের প্রথম টেস্ট বলেই। এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিগ্যেস করা হলে বলেন, 'প্রথম কয়েকটা ওভার সত্যিই একটু নার্ভাস ছিলাম। পরে মনে হল, এই বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই তো আমি রান পেয়েছি। সুতরাং ভয়ের কী আছে। তাছাড়া রবি শাস্ত্রীর মতো পার্টনার পেয়েছিলাম। এটাও একটা মস্ত সুবিধা ছিল।' কিন্তু দ্বিতীয় দিনের কুড়ি মিনিট এবং তৃতীয় দিন যতক্ষণ ব্যাট করেন, তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সংযত ব্যাটিংয়ের প্রতিমূর্তি। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যাট মাঝে মাঝেই ঝলসে উঠেছিল। যে কোন বাজে বলই তাঁর ব্যাটে লেগে তীব্র বেগে ছুটে গিয়েছিল সীমানার বাইরে।

কলকাতা ও মাদ্রাজ দুটি টেস্টেই দেখা গিয়েছিল আজাহারউদ্দিনকে আউট করতে ইংল্যান্ডের বোলাররা যথেষ্ট বেগ পেয়েছেন। প্রথম টেস্টের পর ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার তো পরিষ্কার বলে ফেলেন যে, শ্রীকান্ত আজাহার-উদ্দিনের মধ্যে দ্বিতীয়জন ভারতীয় দলে এলেই তিনি বেশি চিন্তিত হবেন। কারণ শ্রীকান্তকে লোভ দেখিয়ে আউট করা যায় কিন্তু আজাহারকে, নৈব নৈব চ। তাঁর এই মন্তব্য যথার্থ, পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়ে গেছে।

১৯৮৪-৮৫ মরশুমে ইংল্যান্ড যখন ভারত সফরে আসে তখন পর্যন্ত বিশেষ কেউই আজাহারউদ্দিনের নাম সম্ভাব্য টেস্ট ক্রিকেটারের তালিকায় রাখেননি। কিন্তু সফরের দ্বিতীয় ম্যাচেই ইংল্যান্ড পরাজিত হয় ভারতের ২৫ বছরের



কলকাতায় জীবনের প্রথম টেস্টে আজাহারউদ্দিন

কমবয়সীদের দলের কাছে। পরাজিত হয় এক ইনিংস ও ৫৯ রানে। সেই ম্যাচে সবচেয়ে নজর কাড়েন আজাহারউদ্দিন ১৫১ রান করে। এই খেলার ভিত্তিতে তিনি চলে আসেন দিল্লির দ্বিতীয় টেস্টের ভারতীয় দলের ১৪ জনের মধ্যে। আর এর কয়েকদিন পরেই তিনি আরেকটি অনন্য নজির গড়েন। বিভিন্ন প্রদেশকে নিয়ে যে প্রতিযোগিতা হয় তার নাম রঞ্জি ট্রফি। সেই রঞ্জি ট্রফির খেলা – হায়দ্রাবাদ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ। অন্ধ্র প্রদেশেরই মছলিপত্তনম শহরে। হায়দ্রাবাদের পক্ষে খেলতে নেমে করলেন জোড়া সেঞ্চুরি – দু ইনিংসে দুটি। এরপর তাঁকে টেস্ট দলে নেওয়াটা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি নির্বাচকদের পক্ষে।

আজাহারউদ্দিন ভারতীয়দের মধ্যে অষ্টম ক্রিকেটার যিনি জীবনের প্রথম টেস্টেই শতরান করলেন। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে এই নজির সৃষ্টিকারী ভারতীয় হিসেবে তিনি দ্বিতীয়। এর আগে দীপক শোধন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই কলকাতার মাঠেই ১১০ রান করেছিলেন ২২ বছর আগে। এবার আজাহারউদ্দিনও করলেন ১১০ রান। হায়দ্রাবাদের খেলোয়াড় হিসেবেও অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করায় তাঁর স্থান দ্বিতীয়। এর আগে আব্বাস আলি বেগ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওদেশেরই ম্যানচেস্টারশহরে ১৯৫৯ সালে তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে করেন ১১২ রান। বাকি যে পাঁচজন অভিষেক টেসেট সেঞ্চুরি করেন তাঁরা হলেন – লালা অমরনাথ, এ জি কৃপাল সিং, হনুমন্ত সিং, সুরিন্দার অমরনাথ এবং গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। এঁদের মধ্যে একমাত্র বিশ্বনাথই পরবর্তী পর্যায়ে আবার সেঞ্চুরি করেছেন। এদিক থেকে আজাহারউদ্দিন দ্বিতীয় জন, যিনি অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করে পরে আবার সেঞ্চুরি করেছেন।

বিশ্বনাথের প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের এক অনন্য আর্টিস্ট। তাঁর লেট কাট দেখতে পাওয়া ছিল অসীম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তিনি খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটে এই স্ট্রোকটা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। জীবনের প্রথম দুটি টেস্টেই কিন্তু আজাহারউদ্দিনের খেলায় সেই সুন্দর নয়নমনোহর স্ট্রোকটিকে ক্রীড়ামোদী দর্শক ফিরে পেয়েছেন।

আজাহারউদ্দিনের ব্যাটিংখ্যাতি মাত্র দুটি টেস্টেই এত প্রবল যে, তার সম্পর্কে একটা কথা ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটাররা বলতে শুরু করে দিয়েছেন – 'Here comes Trouble' আর তাঁর প্রিয় জামাটির গায়ে লেখাই থাকে এই তিনটি কথা। সত্যি ইংল্যাণ্ডের কাছে তিনি যে যথেষ্ট ট্রাবলসাম তাতে তো কোন সন্দেহই নেই।

মহম্মদ আজাহারউদ্দিনের জন্ম ১৯৬৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। বাবা আজিজউদ্দিন রেলের চাকুরে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আজাহার কাজ করেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দ্রাবাদে। অমায়িক, বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির আজাহারউদ্দিন বর্তমান ভারতীয় দলের সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ ক্রিকেটার। তিনি রোজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে প্রার্থনায় বসেন এবং তারপর আরো চারবার। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারেও তিনি খুবই লাজুক। সাধারণত সেরকম পরিস্থিতি তিনি এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করেন। নিজে তো ফ্লার্ট করেনই না, কেউ তা করলে তিনি তার থেকে একটু দূরে থাকতেই ভালবাসেন। আর বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে কেউ তাকে কিছু বললেই তিনি সরাসরি বলেন, মেয়েদের সঙ্গে স্মার্ট করা তাঁর পছন্দ নয়। বাবা-মা যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করবেন। তাকেই বিয়ে করবেন কিন্তু বছর কয়েক বাদে যখন তিনি নিয়মিতভাবে ভারতীয় ক্রিকেটদলের খেলোয়াড় হবেন এবং অঢেল টাকা ও নাম অর্জন করবেন তখনও কি তিনি সেই পুরনো, ধর্মপ্রাণ, নম্র আজাহারউদ্দিনই থাকবেন?

ফটো : শংকর নাগ দাস



ইট

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

শীতের আকাশে শেষ রাতের আবছা অন্ধকার। শহরের ঘুম ভাঙেনি ভালো করে। শুধু পাশের বাড়ির খোলা কল থেকে একটানা জলের শব্দ। স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে আবার লেপের মধ্যে সবে ঢুকেছে মঞ্জরী। সেইসময় বেশ পাড়া কাঁপিয়ে একটা ভারী কোন গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে।

একটু পরেই বেল্ বাজলো।

রাস্তার ওপরেই বাড়ি। বসবার ঘরে এসে জানলা খুলে দেখলো একটা প্রকান্ড লরি, ইট বোঝাই, পেভমেন্টের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা কুয়াশায় অস্পষ্ট।

চায়ের জল তৈরি হবার আগে আরো মিনিট পাঁচেক লেপের তলায় থাকতে পারতো! বিরক্ত হয়ে উঠে একটা চাদর টেনে নিয়ে কাফতানের উপর জড়িয়ে নিলো মঞ্জরী। দরজা খুলে দেখে একজন লোক লুঙ্গি আর হাতকাটা সোয়েটার গায়ে; একটা কাগজের স্লিপ এগিয়ে দিল।

—কি চাই?

—এই ঠিকানা? মাল এসে গেছে। কোথায় ফেলবো?

—মাল? মানে ইট? কি হবে? দেখি স্লিপটা?

একটা চালান। মিসেস অবন্তী মজুমদারের নামে। অর্থাৎ মায়ের নাম। মা এতো ইট নিয়ে কি করবেন?

দরজাটা দুম করে বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে

গেল।

একতলায় চারখানা ঘর। শেষ ঘরখানা মায়ের। রাস্তার ধারে বসবার ঘর।

অবন্তী বাথরুমে। শব্দ করে কুলকুচি করছেন। মঞ্জরী বেশ জোরেই ডাকলো —মা—

কেন ডাকছে প্রশ্ন না করেই বললেন—বেল্ দিলো কে রে?

—তোমার নামে এক লরি বোঝাই ইট এসেছে। কি ব্যাপার?

অবন্তীর চোখেমুখে একটা সন্ত্রস্ত ভাব খেলে গেলো—ও হ্যাঁ হ্যাঁ! তা এখন? এই কাকভোরে? সাত সক্কালে?—বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

ঠোঁটে সংশয়ের টান মেরে মঞ্জরী চালানটা মায়ের হাতে দিলো—যাও কি বলবে বলে এসো। আমার চায়ের জল ফুটে গেলো।

ইটগুলো যেন মাথার মধ্যে ঢুকে গেলো। পোড়া লাল রঙের। ওজন কত? কে জানে! একটা লরিতে কত ধরে? পাঁচ শো? হাজার? দু হাজার? নামিয়ে কোথায় রাখবে? ছাতে —না কি পেভমেন্টে?

একতলা এই বাড়িখানায় চারখানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, পেছনদিকে ছোট্ট একটা বারান্দা নিয়ে বাবার আমল থেকেই রয়েছে। গত কুড়ি বছরের মধ্যে একবারই সারানো হয়েছিলো। পুরোনো দিনের মালমশলা বলেই মোটামুটি দেয়াল জানলা দরজা সবই টিকে আছে; বেশ মজবুত।

অতোগুলো ইট দিয়ে কি সারানো হবে? অতো ইটে আধখানা বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে হয়তো! না, মঞ্জরীর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞান নেই।

বাবার মৃত্যু হয়েছে সেই কুড়ি বছর আগে; সে তখন সবে বি· এ পরীক্ষা দিয়েছে। কুড়ি বছর আগেও প্রবল বেকার সমস্যা ছিলো। তার জন্যে প্রচুর হেঁটেছে রাস্তায় রাস্তায়। বাবার পুঁজি ভেঙে টিপে টিপে চলেছে। অবন্তী কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে রান্না করেছেন আর ঈশ্বরকে মুখনাড়া দিয়েছেন।

মঞ্জরী হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজেছে। তারই ফাঁকে স্টেনোগ্রাফী আর টাইপিং শিখেছে। ভাই ফার্স্ট ইয়ারে—তার পড়া থামালে চলবে না। বোন শর্বরী স্কুলে। অভীককে পড়াতে হবে, শর্বরীর বিয়ে দিতে হবে।

রান্না করতে করতে অবন্তী ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছেন আর অপেক্ষা করেছেন কখন মঞ্জরী বাড়ি ঢুকেই বলবে—'মা চাকরি পেয়েছি।'

মঞ্জরীর মুখ চেয়েই তো নিশ্চিন্ত জীবনের অনাগত আশ্বাস।

একদিন সত্যি সত্যি সেটা ঘটে গেল। বহু ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে; অপমানকর কথাও শুনতে হয়েছে। প্রতিদিন অবন্তী প্রশ্ন করেছেন —কিছু হলো? (কিছু হলো না)

—কোন আশা আছে? (কোন আশা নেই)

—কি বললো? (রুক্ষ প্রত্যাখ্যান)

উত্তরগুলো শোনাতে বিশ্রী লাগে। উত্তর দিতেও বিব্রত বোধ হয়। গম্ভীর মুখে হ্যাঁ হুঁ করে ঘরে ঢুকে যায়। মুখ নিচু করে চায়ে চুমুক দেয়। অবন্তী খুব কর্তব্যপরায়ণ কর্ত্রী। সংসারের চেহারা মলিন-বিষণ্ণ। কিন্তু মুখের সামনে গরম চায়ের কাপটি তিনি ঠিক সময়মতো তুলে ধরবেন। তারপরেই বলবেন—গতি একটা নিশ্চয় হবে। অতো ভাবিসনি।—তিনি আশাবাদী। মায়ের চেয়ে মঞ্জরীর ভাবনা ঢের বেশি। তার ভবিষ্যতে একটিমাত্র লক্ষ্য—চাকরি।

এখনো টিউশনির টাকায় ইলেকট্রিক বিলটা চলে যাচ্ছে। ভাইবোনেদের পড়ার খরচ তাদের প্রতিভার জোরেই চালিয়ে নিচ্ছে। অভীক টিউশনি করছে। পূর্ববঙ্গের মানুষ ওরা; জীবনের কাছে হার মানে না। প্রপার গেটআপ ঠিক বজায় আছে। বাইরে থেকে বোঝা যাবে না—দুবেলা খাবার খরচ করতে কি পরিমাণ পুঁজি নিঃশেষ হচ্ছে। সেদিকে মঞ্জরীর দৃষ্টি আছে। মনে হলেই বুকের ভেতর ঠান্ডা হয়ে যায়। বোনের বিয়ে? আমাদের দেশে ভালো পাত্র মানে ভালো খরচা। ভালো দাম দিয়ে যে পাত্র কিনতে হয় সে কোন হিসেবে ভালো?—থাক চিন্তা করার সময় নেই। আগে চাকরি। ব্যাঙ্কে কিছু তলানি রাখতেই হবে। নয়তো শর্বরীর বিয়ে আটকে যাবে।

চাকরি একটা পেয়ে গেলো। রিসেপশনিস্টের কাজ। দুশ্চিন্তায় এবং স্বল্পাহারে চেহারা পাকিয়ে গেছে। তবু জ্বলজ্বলে চোখ, ঘন চুল আর ছিপছিপে শরীরে বেশ লাগে মঞ্জরীকে। পরিশ্রমী মেয়ে। সুতরাং ধাপে ধাপে উন্নতি।

তারই ফাঁকে সংসারের ভোল পালটেছে। ড্রইংরুমে নতুন নতুন পর্দা। শোবার ঘরে চকচকে বেডকভার। মাঝে মাঝে হোয়াইট ওয়াশ। রান্নার একট ঠিকে লোকও আছে। অবন্তী অজস্র বই পড়ার সময় পাচ্ছেন। শর্বরী এম· এ পাস করলো। মঞ্জরীর আর পড়া হলো না। শর্বরীর বিয়ে হলো; শ্বশুরবাড়ি চলে গেলো। অফিস থেকে ধারদেনা করে মঞ্জরীই পিতার ভূমিকা নিয়ে মোটামুটি ভদ্রভাবেই পুঁজি নিঃশেষ করে শর্বরীর বিয়ে দিলো। সেই তখনই একবার বাড়িটাকে সারানো হয়েছিলো।

তারপর অভীক চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই বিয়ে করে দিল্লি চলে গেলো। অভীকের সঙ্গে দু একছত্র চিঠির সম্পর্ক ছাড়া আর বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। অভীকের স্ত্রী চায় না শাশুড়ির দায়িত্ব নিতে।

মঞ্জরী একা—অথচ বন্ধনমুক্ত নয়; মা আছেন। অনেক কাজ করলো; সময়ের সিঁড়ি বেয়ে চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেলো।

শর্বরীর বিয়ের চিন্তায় অবন্তীর ঘুম হয়নি। জামাইকে কি দেবেন—পুজোয় কেমন তত্ত্ব করবেন, কুটুমবাড়িতে মুখ থাকবে কি করে এইসব সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছেন। অভীকের সংসার ঠিক চলছে কিনা, জন্মদিনের উপহারটি সময়মতো পৌঁছালো কিনা সে বিষয়েও দুশ্চিন্তার অবধি নেই। প্রয়োজন মঞ্জরী মিটিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জরীর ভবিষ্যৎ? ওই চিন্তাটুকু যে করতে হবে সেই ঔচিত্য বোধ তাঁর জন্মায়নি।

মঞ্জরীর প্রচুর মানুষের সঙ্গে পরিচয়। একটা মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির রিসেপশনিস্ট থেকে এখন লেডি অফিসার। খাতির আছে। স্তাবকও আছে। একদিন বাড়ি ফিরে বললো—আমি বিয়ে করবো মা!

অবন্তী রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সদ্য গীতাপাঠ শুনে এসেছেন। সংসারে তুমি কার কে তোমার নীতিতে হৃদয় আপ্লুত; স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চ উভৌ যেন অনুপশ্যান্তি—স্বপ্নে জাগরণে যা দেখছো সবই মিথ্যা! এই ভাবটিকে লালন করতে করতে তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

মঞ্জরীর কথা শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। তারপরে ফিরে এলেন বাস্তব পৃথিবীতে; রূঢ় রণাঙ্গনে। কঠিন সত্যের জগতে।

মঞ্জরীর বিয়ে? মঞ্জরী, তাঁর মেয়ে? কতোকাল পরে কথাটা মনে হলো। মঞ্জরী নামে একটা মেয়ে ছিলো কুড়ি বছর আগে যখন সে বি· এ পরীক্ষা দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যু। লাইফ ইনসিওরেন্স প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আদায় করা থেকে সংসারকে ভাঙনের মুখ থেকে বাঁচিয়ে চলেছে একটা পাতলা রোগা মেয়ে? দুখানা শুকনো হাত দিয়ে আগলে রেখেছে ভদ্রতার মলাটখানা। ছোটবোনের বিয়ে দিয়েছে; ভাইকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দিনের পর দিন বোনের বিয়ের দেনা শোধ করেছে।

কুড়ি বছর পরে সে হঠাৎ বলে বসলো—মা আমি বিয়ে করবো!—কি আশ্চর্য!

মঞ্জরী সংসারের কর্ণধার—তার কথা আলাদা করে চিন্তা করার কি আছে? সে তো বড়? সব ব্যাকুলতা—সব দুশ্চিন্তা তো ছোটদের নিয়েই হয়? কিন্তু মঞ্জরীর বিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য। মঞ্জরী তাঁরই মেয়ে। হঠাৎ এই চৈতন্যটা উন্মত্ত হয়ে অবন্তীর মাথার মধ্যে দাপাদাপি করে উঠলো। ভেতরটা থরথর করছে।

অবন্তী বসে পড়লেন চামড়ার গদিমোড়া আর্মচেয়ারের ওপর। এই আরামের সামগ্রীটি মঞ্জরীই এনেছে তার মায়ের জন্যে। এইটাতে বসে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে তিনি মহাসুখে বই পড়েন; দুপুরবেলা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন

রেডিওতে। সামলে নিলেন নিজেকে। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে পানের ডিবে বার করে ছোট্ট একটি পান মুখে পুরলেন ; মিনেকরা ছোট্ট কৌটো থেকে এক চিমটি সুগন্ধী জর্দা নিলেন। বললেন—বোস্! পাত্রটি কে বল্ দিকি ?

—আমারই কোলিগ্। পারচেজ্-এ আছে, সুগত ভট্চাজ। ডিভোর্সী।—একটুও ইতস্তত না করে সোজাসুজি মঞ্জরী বললো।

—এ্যাঁ ? দ্বিতীয় পক্ষ ? ছেলেপুলে আছে নাকি ?

—না।

—ছেলেটি কেমন ? ডিভোর্স কেন হলো ?

মঞ্জরী অসহিষ্ণু হয়ে জবাব দিলো—মিলল না। পার্সোন্যালিটি ক্ল্যাশ্।

অবন্তী কেমন যেন একটা কারণ পেয়ে গেলেন বিয়েটা নাকচ করার। কিন্তু মঞ্জরী চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে অকস্মাৎ লজ্জাবতী অনূঢ়া হয়ে যেতে পারে না। তাকে উল্টোপাল্টা বোঝানোও মূঢ়তা।

অবন্তী বললেন—তাহলে যোগাড়-টোগাড় করতে হয়! একটু তৈরি হতে হবে আগে। বিয়ে তো হুট বললেই হয় না ? আয়োজন করতে হবে।

কিসের আয়োজন ? তৈরি কিসের ? —মঞ্জরী উদ্ধত প্রশ্ন করে। ডির্ভোসীকে বিয়ে করবো। দ্বিতীয় পক্ষ। আমি কি কারুর মুখাপেক্ষী ? আমার চাকরি আছে—প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে। এতোটা বয়সের প্রথম পক্ষ কোথায় পাবে মা ?

এতোদিন প্রথম পক্ষ খোঁজনি কেন ? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চেপে গেলেন।

—তবে তোমার চিন্তা নেই। তোমাকে দেখবো সে কথা হয়ে গেছে। তোমার ছেলে থেকেও তোমাকে দেখে না যখন, তখন বাড়ির বড়ো হবার দায়িত্ব ঠিকই পালন করবো। এখন কি আর সন্তান নিয়ে সংসার পাবো ? একটা সাহচর্য—এ ছাড়া আর কি ?

ছেলের ওপর কটাক্ষটা হজম করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মনে হাসি টেনে এনে অবন্তী বললেন—তাহলে গয়না-টয়না দু একটা করতে হয় ? ক্যাশ কিছু লাগবে। আমারও তো সাধ-আহ্লাদ আছে!

মেয়ের দিকে অস্থির চোখে চাইলেন। আগেকার রণক্লান্ত চেহারা আর নেই মঞ্জরীর। বয়স ওকে ছোঁয়নি। স্লিম-টল, মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির অফিসারের মতোই পরিতৃপ্ত মুখের জলুস। খুবই আকর্ষণীয়া।

—পাবে। সেটুকু হয়ে যাবে। মঞ্জরী আশ্বাস দেয়।

ব্যাঙ্কে নিজস্ব কিছু আছে ; প্রভিডেন্ট ফান্ডেও হাত পড়তে পারে। জোড়াতালি দিয়ে হাজার দশেক হয়ে যাবে হয়তো। তবে ওইটুকুই মঞ্জরীর সম্বল। সংসারের ঠাট-ঠমক বজায় রাখতে যত্র আয় তত্র ব্যয়। তারই মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ-চিন্তা করে যাচ্ছে মঞ্জরী।

আকাশে আলো ফুটেছে। রেডিওতে ভোরের সুরে গান হচ্ছে। চায়ের টেবিলে বসে একটা বিস্কুট কামড়ে নিলো মঞ্জরী। কুড়ি বছরের অতীত ক্ষোভ একঝলক ছবির মতো ফুটে উঠলো।

এতো ইট কিসের জন্যে যা মঞ্জরী জানে না ?

বাইরে ইট নামানোর শব্দ হচ্ছে। অবন্তী চায়ের টেবিলে ফিরে এলেন। ইটওলাদের কি বলেছেন কে জানে! অবন্তী চেয়ারে বসেই চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজটা টেনে নিলেন।

মঞ্জরী এক কাপ চা ঢেলে দিয়ে বললো —কি হলো ইটের ?

—বলে দিয়েছি। ত্রস্ত জবাব অবন্তীর। কাগজ পড়তে ভীষণ ব্যস্ত।

মঞ্জরী কঠিন স্বরে বললো— কি ব্যাপার কি ? ইট কি হবে ?

—ও, তোকে বলিনি বুঝি ? ভাবছি দোতলায় একখানা ঘর, একটা বাথরুম যদি করে নিতে পারি তো আমার একটা ফ্ল্যাট হয়ে যায়। তাহলে একতলাটা ভাড়া দিয়ে আমার চলে যাবে।

—তোমার জন্যে চিন্তা আমার আছেই। আমি কি সেসব না ভেবেই বিয়ে করছি! কিন্তু আমাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না ? বাড়ি মেরামত করতে এতো ইট লাগতে পারে না। আমি তাই অবাক হচ্ছিলাম এতোক্ষণ ধরে! তা টাকা এলো কোত্থেকে ? তোমার ছেলে দিচ্ছে ? ইঞ্জিনীয়ারিং করছে কে ?

অবন্তী সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করেন—কেন তুই যে দশহাজার টাকা দিলি ?—

আধখানা বিস্কুট মুখ থেকে নামিয়ে রাখলো মঞ্জরী। বিস্মিত কণ্ঠে বললো—সে তো বিয়ের খরচ! গয়না গড়াবার জন্যে। আমার বিয়ের খরচ আমাকেই করতে হবে তো ?

—কিন্তু আমাকে কে দেখবে বল ? তুই বিয়ে করে চলে যাবি—তারপর কি হবে ?

মাথায় যেন একটা ছুটন্ত থানইট পড়ল। এর নাম মা ? স্বার্থপর, লোভী, আত্মসর্বস্ব। কথা বলতেই কষ্ট হচ্ছে। এতো বছর ধরে ও শুধু সংসারের চাকা-ঘোরানোর যন্ত্র ? সংসারের কাছে কিছুই পাওনা নেই ; মায়ের স্নেহও নয় ? একটা ঘৃণ্য বেদনা সর্বাঙ্গে বয়ে গেলো। চায়ের কাপ সরিয়ে উঠে পড়লো।

এ বাড়িতে থাকা যায় না। ওর কোন আপনজন নেই। মা-ও নয়! আশ্চর্য!

পারচেজের সুগত ভট্চাজ! কেন বিয়ে করতে চাইছে ? রোজগার কম করে না। বিয়ে করলে মঞ্জরী অনায়াসে কাজ ছাড়তে পারতো। মা বিশ্বাসভঙ্গ করলেন। কাউকে বিশ্বাস নেই। সুগতকেও নেড়েচেড়ে দেখতে হয় একবার।

উদ্ভ্রান্তের মতো অফিসে চলে গেলো। সুগতকে টেলিফোন করে জানালো—দশহাজার টাকা গয়নাগাটি বানাতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছি। দুজনের একত্র টাকায় ফ্ল্যাট কেনার আশা এখন আর নেই। কেননা এখন অনেকদিনের জন্যে টাকা ব্লকড্ হয়ে গেলো। অতএব তুমি কি বল ?

সুগত ভট্চাজ স্মার্ট উত্তর দিলো—ঠিক হ্যায়। অপেক্ষা করবো আরো দুবছর। ফ্ল্যাট না হলে বিয়ে করে অ্যাপার্টমেন্টের একখানা ঘরে ওঠা যায় না ?

—তবে ?

—এতোদিন অপেক্ষা করেছি—আর একটু অপেক্ষা করতে কি!

—বয়স বেড়ে যাবে না ?

—এমন কি ? এমনিতে তো বেড়েই গেছে!

সুগতর নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ সুগতর কাছে বিয়েটা উপলক্ষ মাত্র। আগের স্ত্রীকে অ্যালিমনি দিতে হয় ; খরচ আছে। ফ্ল্যাট কেনাই বিশেষ উদ্দেশ্য! কিন্তু একার টাকায় সবটা হচ্ছে না!

মঞ্জরী ঠক করে টেলিফোনটা ক্রেড্‌লের ওপর নামিয়ে রাখলো।

সামনে অনিশ্চিত অন্ধকার। নিজের জীবন ? মুক্ত জীবন ? বাঃ! মা বেশ গুছিয়ে নিলেন অ্যাট দ্য কস্ট অব মঞ্জরী। চমৎকার!

প্যান্ট্রি বেয়ারা মুখের সামনে চা দিয়ে গেছে। বিড়বিড় করতে করতে দু'চামচ মুখে তুললো। বিস্বাদ! ভাবলো রেজিগনেশন দেবে। কিন্তু পরে খাবে কি ? বাড়ি ফিরবে না। ফিরবে না—ফিরবে না। ইটের লরির কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট ছবিটা সমস্ত মন তোলপাড় করে দিচ্ছে। আকাশপাতাল চিন্তায় মাথা যেন কেমন করছে ? ব্লাডপ্রেসার নাকি ? হতে পারে। এতোটা শক সহ্য করা কঠিন।

মঞ্জরী অবেলায় ছুটি নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো। সারাদিন আধকাপ চা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি। কোথায় যেন হেরে গেছে সবার কাছে ; আত্মীয় বন্ধু স্তাবক—সবই মিথ্যে ?

একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। এই বয়সে মাকে একলা রেখে কোথায় যাবে সে ? দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মেয়ে কি করে হবে ?

বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত অর্থহীন জীবনের বোঝা নিয়ে ফিরে আসতেই হলো খোলা পরিচিত বৃত্তের মধ্যে—কংক্রীটের খাঁচায়।

শীতের পড়ন্ত রোদে ইটের পাঁজার ছবিটা আর আবছা নয়। খুব স্পষ্ট। অবন্তী একদল মিস্ত্রি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইট গুনছেন ; নিজের ভবিষ্যতের ভিত গাঁথতে।

ছবি : শাশ্বতা


He may not be able to tell the difference between a cow's milk feed and others. But in a couple of years you will.

Your child is born with all the potential for healthy growth. And of course there's nothing like breast feeding for a sound nutritional start to good health. But what happens when it needs to be supplemented or even substituted?

You need a baby food that can give your child everything you can, and maybe even more. That's the promise of Milk Care Special Baby Milk Formula.

A unique cow's milk feed—formula for better growth

Milk Care Special Baby Milk Formula, for the first 6 months, is the only feed in India made of cow's milk.

The multi-nutritional benefits of cow's milk have been recognised by mothers for generations all over the world. For instance, cow's milk has a finer lactose content that makes digestion easier, a unique protein composition and an ideally balanced fat content. And what's more, the unique relationship of the cow with its calf allows a certain secretion in the milk that adds to its nutritional quality. All these properties of cow's milk bring it much closer to human milk than any other kind of food. And that's the reason for you to start your child on the goodness of Milk Care Special Baby Milk Formula. A couple of years from now you'll be thankful you did.

Milk Care Special Baby Milk Formula is ideally followed by Milk Care Follow-on, a critically composed feed for the 3rd month onwards and Milk Care Weaning Food with the goodness of real fruit and cow's milk.

Your baby's first years are a crucial period. And like you we'd never compromise. Because we understand that your child's future growth depends on the way it begins.

Breast feeding is best for your child. Kindly consult your doctor before starting your child on baby foods.

MILK CARE

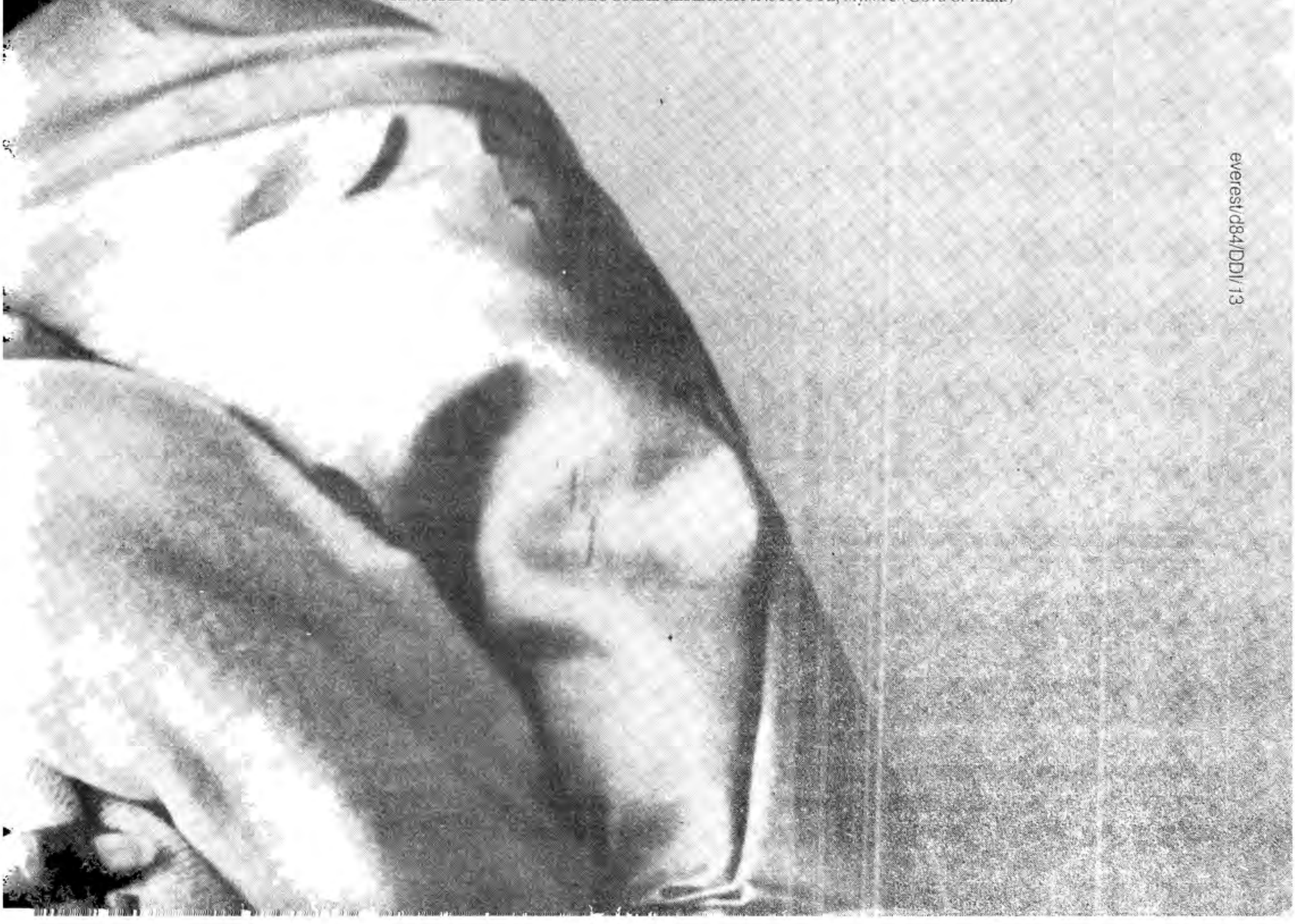


Codex Alimentarius.

Special Baby Milk Formula

The healthiest baby food made exclusively from cow's milk.

Manufactured with technical know-how from the
CENTRAL FOOD TECHNOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE, Mysore (Govt. of India)





তাপস ও নন্দিনী সংবাদ

বিয়ে অনেকেই করেন। কিন্তু কারো কারো বিয়ে সংবাদ হয়, কাগজে কাগজে ছাপা হয় ছবি। যেমন এই মুহূর্তে তাপস ও নন্দিনীর বিয়ে।

পূর্ববঙ্গের মানুষ, বর্তমানে চন্দননগরের বাসিন্দা ডাক্তার গজেন্দ্রচন্দ্র পাল এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা বছর কয়েক আগে বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁদের বাড়ির ছেলে তাপস রাতারাতি মায়াবী পর্দার নায়ক হয়ে উঠে জনগণমনে এমন কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠবে। প্রায় আকস্মিক ভাবেই সমস্তটা ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। একবার খ্যাতি জুটে গেলে, বিশেষ করে সেটা যদি রাতারাতি জোটে, কল্পনাপ্রবণ বাঙালি তা নিয়ে নানান গল্প ফাঁদতে ভালবাসে। তাপস পাল সম্পর্কেও এমন কিছু গল্প আড়ালে আবডালে শোনা গেছে। সে নাকি আসলে নাটক পাগল ছেলে, গ্রুপ থিয়েটার করত – এইসব কত কী! সম্প্রতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার পর পরই এই প্রতিবেদকের সঙ্গে মোলাকাত হতে কথা প্রসঙ্গে তাপস নিজেই অস্বীকার করলেন সে-সব কাহিনী। বরং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন, – আমি যেদিন তরুণ মজুমদারের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম, কেমন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে যেন ছিলাম, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। গায়ে চিমটি কেটে পরখ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে! সেদিন পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীনিবাসদা। তরুণদার সহকারী শ্রীনিবাস চক্রবর্তী চন্দননগরের লোক। উনিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তরুণদার কাছে। অস্বীকার করে লাভ নেই, তখনকার অনুভূতিটা আমার কাছে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পাবার মতো। সেদিক থেকে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি। অর্বাচীন হলেও প্রথমেই এমন একজন পরিচালকের ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেলাম, যিনি ব্যক্তিগত ভাবেও অত্যন্ত হৃদয়বান। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা বোধ করি তরুণদার ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে – প্রথম আলাপেই ওঁরা সকলে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন।

আপনার প্রথম ছবি 'দাদার কীর্তি'তে কাজ করার আগে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কি একেবারেই ছিল না?

সত্যি কথা বলতে গেলে কিছুই ছিল না। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়টা ভালবাসতাম, দু-একবার যে নাটক না করেছি তাও নয় – তবে সেটাকে ঠিক অভিজ্ঞতা বলে না। এমন ভালবাসা আমার অনেক কিছুর প্রতিই আছে – সাধারণ আর পাঁচজনের যেমন থাকে। যেমন ফুটবল হকি ভালবাসি আমি, আবার গান এমনকি তবলাও চর্চা করেছি। অভিনয়ের প্রতি ভালবাসার মাত্রাটাও ছিল এইরকম – আলাদা কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, যেটা নিয়মিত করতাম তা হল আবৃত্তি। স্কুল কলেজে পড়ার সময় বেশ কয়েকবার প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছি। কিন্তু অভিনয়টাই আমার জীবনের পেশা হবে – এটা কল্পনাতেও কখনো ভাবিনি। ভাবার সুযোগও ছিল না। আমি বায়ো-সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি হুগলী মহসীন কলেজে। লক্ষ্য ছিল ডাক্তার হবার। বাবা ডাক্তার, মেজদি ডাক্তার। বাড়ির একমাত্র ছেলে আমি, স্বভাবতই মা-বাবার ইচ্ছে ছিল, আমিও ডাক্তার হই।

সে ইচ্ছে কি এখন আর সফল করার সুযোগ নেই?

এখন আবার পড়াশোনা! না, তা আর সম্ভব নয়। আর তাছাড়া আকস্মিকভাবে হলেও আমার জীবনের সম্ভাবনার একটা পথ যখন পেয়েছি, তখন তাকে অবহেলা করে অন্য পথে ফিরে যাবো কেন?

এ পথে মা-বাবার সমর্থন কতটুকু?

প্রথম তো আমি বা আমার মা-বাবা কেউই ফিল্মের অভিনয়টাকে সিরিয়াসলি নিইনি। শুরুতে তরুণবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হল। মা-বাবা যেন খানিকটা শখ করেই রাজি হয়ে গেলেন। দাদার কীর্তির পরই সাহেব ছবিটি করলাম। পর পর দুটি ছবিতেই আমার অভিনয় প্রশংসিত হল – আর এই সুবাদে অন্যান্য আরো কয়েকজন পরিচালক আমাকে দিয়ে তাঁদের ছবিতে কাজ করাতে চাইলেন – বেশ ব্যস্ত হয়েই পড়লাম। এই ব্যস্ততার পরিপ্রেক্ষিতেই একদিন ভরসা পেলাম, ফিল্মটাকেই পেশা করতে।

ভবিষ্যৎ?

সেটা আগে থেকে আর কে বলতে পারে!

বাংলা চলচ্চিত্রে তাপসের আবির্ভাব এই তো সেদিনের ঘটনা বলে মনে হলেও এর মধ্যে তিনি প্রায় এক ডজন ছবিতে অভিনয় করেছেন। দাদার কীর্তির পরই বিজয় বসুর দুটি ছবি – সাহেব ও সমাপ্তি করেছেন মহুয়া ও দেবশ্রীর সঙ্গে। পরবর্তী ছবি মুনমুন সেনের সঙ্গে দীপার প্রেম। এরপর যথাক্রমে রাজেশ্বরী, পারাবত প্রিয়া, হুলুস্থূল, অজান্তে, যোগবিয়োগ, নিশান্তে, লালমহল, বৈদূর্য রহস্য প্রভৃতি। লেখা বাহুল্য, এর সবগুলো মুক্তিপ্রাপ্ত নয়। এই মুহূর্তে আবার তরুণ মজুমদারের বর্তমান ছবি ভালবাসা ভালবাসায় অভিনয় করছেন তাপস।

আর এই ভালবাসা ভালবাসার শুটিং চলার ফাঁকেই নিজের জীবনের ভালবাসার ভাল বাসাটি নির্বাচন করলেন তাপস। এও যেন কিছুটা আকস্মিক ভাবেই। আকস্মিক, অন্তত তাদের কাছে, যারা উঠতি নায়ক তাপসের সঙ্গে মনে মনে একটা রোমান্স রচনা করে চলেছিল। আচমকা তাদের অনেকের গভীর গোপন স্বপ্ন ভঙ্গ করে তাপস তাঁর জীবনসঙ্গিনী ঠিক করলেন



সন্ধ্যা রায় ও শাশুড়ি মীরা পালের সঙ্গে নন্দিনী



আশীর্বাদ করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চাকদহ নিবাসী মুখার্জি পরিবারের মেয়ে নন্দিনীকে।

অনেকেরই প্রশ্ন এই বিয়েটা লাভ না নিগোসিয়েটেড ?

ইতিমধ্যে পরিচিত নিষ্পাপ সরল হাসি মুখে ছড়িয়ে দিয়ে এই মুহূর্তে পুলকের অন্তঃসলিলে ভেসে থাকা সলজ্জ তাপস জবাবটা দিলেন অকপটে – দুই-ই বলতে পারেন। বন্ধুর বাড়িতে আলাপ নন্দিনীর সঙ্গে। ভাল লাগল। বাড়িতে জানালাম। তারপর বাবা-মা-ই দেখাশোনা করে সমস্ত পাকা করলেন।

প্রথম ভাল লাগাটা কার, আপনাকে নন্দিনীর, না নন্দিনীকে আপনার ?

সম্ভবত একসঙ্গেই ঘটেছিল এই ব্যাপারটা। তাই কেউ কাউকে যাচাই করার সুযোগই পাইনি। আমার সঙ্গে কথা বলে নন্দিনীর ভাল লাগল, আর নন্দিনীকে দেখে মনে হল, ওই আমার উপযুক্ত। ওকে দেখে ওর ব্যবহার, মানসিকতা সবই আমাকে আকর্ষণ করল।



নব দম্পতির সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মেয়েদের কী ধরনের ব্যবহার, মানসিকতা আপনার পছন্দ ?

মনের দিক থেকে পরিচ্ছন্ন আটপৌরে মেয়েদেরই আমার ভাল লাগে। সাজ পছন্দ করি কিন্তু সেটা উগ্র হলে বিশ্রী লাগে। প্রকৃতিগত দিক থেকে আমি নিজেও খানিকটা তাই। সহজ যা, সরল যা – তার প্রতি ইমোশন্যাল হয়ে পড়ি।

আপনি সবে খ্যাতি পেয়েছেন, একদিক থেকে কেরিয়ারের এই শুরু, আর নন্দিনী সবে কলেজে পা দেবার মুখে – বিয়েটা কি একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না ?

আমার তা মনে হচ্ছে না। আর বাবা-মাও চাইছিলেন, বিয়েটা করে ফেলি। অতএব...।

অতএব, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের জীবন সুখী হোক। আরো আরো সাফল্যে পরিণত হয়ে উঠুক আপনার প্রতিভা।

বিশেষ প্রতিবেদক

ফটো : অর্ধেন্দু রায়

নব দম্পতির সঙ্গে মাধবী চক্রবর্তী ও অরুন্ধতী দেবী



টিকিট:
নূ/টা ১ মাত্র

ড্রঃ ২৬.১.৮৫
থেকে দৈনিক

ভুটান লক্ষী
দৈনিক লটারী



প্রথম পুরস্কার : Nu/Rs. 1 lakh

দৈনিক মোট পুরস্কার সংখ্যা ৪৪২০৬
পুরস্কারের টাকা থেকে আয়কর কাটা হয়না

রোজ কিনুন রোজ জিতুন

ডিরেক্টরেট অফ্ লটারীস
রয়্যাল গভঃ অফ্ ভূটান
ফুন্টসিলিং

অর্গ্যানাইজিং এজেন্ট
মনিয়ান এজেন্সি
৯ লেডি দেসিকা রোড
মাদ্রাজ। ফোনঃ ৭৩৭২৫

সব জায়গায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। আজই কিনুন



এখন আমি অভিনয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ খুঁজছি —স্মিতা পাতিল



এখনকার অভিনেত্রীদের অনেকেই স্মিতা পাতিলের তুলনায় বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকেন। অথচ প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস, গ্ল্যামার এবং সীমাহীন উচ্চাকাঙক্ষায় তাঁদের কেউ কেউ প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। তুলনায় স্মিতা পাতিল একান্ত ভাবে নিজেকেই জানতে চান, তিনি অনেক অন্তরঙ্গ এবং সহানুভূতিশীল। অঙ্গুলিগ্রাহ্য মাত্র কয়েক জন অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন, যাঁদের মতো স্মিতা ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। তাঁর ছবিতে আজকালকার দর্শকের ইচ্ছা ও আকাঙক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে স্মিতা সবিশেষ দক্ষ। উদ্দাম ও উচ্ছল আশির দশকের অভিনেত্রী স্মিতা পাতিল। তাঁর সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল সেটি এখানে তুলে ধরছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে বলুন। আপনি ফিল্মে এলেন কেন? সেটা কি আর্থিক প্রতিপত্তি লাভের জন্য?

উত্তর ঃ আমি মহারাষ্ট্রের এক বিত্তশালী পরিবারের কন্যা। আমার শৈশব কেটেছে পুনেতে। আমার বাবা ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। তিনি মহারাষ্ট্র বিধানসভার সদস্য এবং মন্ত্রী ছিলেন। আর্থিক প্রতিপত্তি লাভের জন্য আমি ফিল্মে আসিনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজে এবং আমার সহপাঠিনী রোহিণী হাত্তংগদি (যিনি 'গান্ধী' চলচ্চিত্রে কস্তুরবার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন) কেউই তখন স্কুলের নাটকানুষ্ঠানে সুন্দরী এবং উপযুক্ত অভিনেত্রী হিসেবে বিবেচিত হইনি। পুনেতে শৈশবে বয়ঃসন্ধির দিনগুলোতে সবসময়ই কেমন একটা উৎকণ্ঠায় দিন কাটত। মনে হত আমি জনপ্রিয় নই।

প্রঃ সেই সময়ে আপনার কি কোনো স্বপ্ন ছিল?

উঃ লাজুক এবং অনিশ্চয়তায় ভোগা ছোট্ট

একটি মেয়ে যদিও ছিলাম, কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে বম্বে আসি। এখানে ফোরজেট হিলে আমাদের বাসস্থান ছিল—সামিট হাউস। সে সময় আমি টিভিতে সংবাদ ভাষ্যকারের কাজ পাই। আমি তখনও ছাত্রী এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা পাঠক্রমে শিক্ষালাভ করে চলেছি। সে-সময় অমি আত্মবিশ্বাস অর্জনে সচেষ্ট ছিলাম।

প্রঃ আপনার প্রথম ছবি কি ?

উঃ আমি যখন ইন্টার-আর্টস পড়ছি তখন ছোটদের উপযোগী 'চরণদাস চোর ছবির একটি চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হই এবং বম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে স্নাতক হবার আগেই শ্যাম বেনেগালের 'নিশান্ত' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হই।

প্রঃ আচ্ছা, 'নিশান্ত' ছবিতে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আপনি কী মনে



স্মিতা পাতিল



স্মিতা পাতিল

করেন ?

উঃ বেনেগালের ছবিতে মহিলা চরিত্রগুলি প্রায় স্থুলবুদ্ধিসম্পন্না এবং কিছুটা আতঙ্কগ্রস্তা। নিজের ব্যক্তিগত সমস্যাকে অন্যান্য মহিলার ওপর আরোপ করা হয় সেখানে। বাঙালি মহিলাদের ইমেজ পরিষ্কার ভাবে আনতে কিছুটা অসুবিধা হলেও আমি নিজেকে এ-ব্যাপারে খাপ খাইয়ে নিই। অবশ্য যখন আমি 'মন্থন' ছবিতে কাজ করি তখন বেনেগালের চরিত্রায়ণের পন্থাই গ্রহণ করি। তারপরই দেখা গেল যেন বেনেগাল স্মিতার ইমেজে অন্যান্য মহিলাদেরও ভাবছেন।

প্রঃ আজকের সুন্দরী মহিলাদের মধ্যে আপনি নিজেকে কোন সারির মনে করেন ?

উঃ আমি নিজেকে খুব সুন্দরী বলে মনে করি না। সেইজন্য যখন 'ইয়ে নজদিকিয়া' ছবিতে কাজ পাই তখন আমি সেটা গ্রহণ করিনি। কারণ সেটি ছিল সুন্দরী মোহিনী নারীর।

প্রঃ কী ধরনের ভূমিকা আপনার পছন্দ ?

উঃ আমি মোটামুটিভাবে একই ধরনের ভূমিকায় অভিনয় করতে ভালবাসি না। যখনই কোনো নতুন ছবি মুক্তি পায়, আমি আমার পরিজনবর্গকে আমন্ত্রণ জানাই 'প্রিভিউ শো' দেখার জন্য। শো দেখার পর তাঁদের খোলাখুলি মন্তব্যও মন দিয়ে শুনি। অবশ্য আমার মাকেই আমার ছবির শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে মনে করি। আমার সবচাইতে বড় আসক্তি হল নাচ ও গানের জায়গাগুলো।

প্রঃ পর্দার বাইরে পোশাকে আশাকে আপনি কিভাবে থাকতে ভালবাসেন ?

উঃ আমি পর্দার বাইরে নিজেকে বিশেষ চটকদার দেখাতে চাই না। যদি কেউ সে-ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেন, তাহলে আমি মনে করব সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনধিকার-চর্চার চেষ্টা হচ্ছে। আমি আমার পোশাক সম্পর্কে অত্যন্ত স্বাভাবিক। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৯৮৩ সালের 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তার কারণ দ্বাররক্ষক আমায় চিনতে পারেননি। অবশ্য তখন শশী কাপুর ও পুনম ধীলন এসে আমায় এ-ব্যাপারে উদ্ধার করেন।

প্রঃ আপনি কোন কোন শিল্পীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বোধ করেন ?

উঃ শিল্পীদের মধ্যে দীপ্তি নাভাল, জয়া প্রদা, রেখা এবং রাজ বব্বরকে আমার ভাল লাগে। আমি মনে করি, মহিলা শিল্পীদের মধ্যে জয়া প্রদা সবচাইতে সুন্দরী।

প্রঃ ফিল্মি জগতের বাইরে অভিনয় ছাড়া আর কী কী করতে ভাল লাগে ?

উঃ আমার ইচ্ছে করে ইনটিরিয়র ডেকরেটর এবং ড্রেস ডিজাইনার হতে।

প্রঃ চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের মধ্যে কাকে আপনি সর্বোচ্চে স্থান দেবেন ?

উঃ যখন কোনো ছবিতে কাজ করি তখন আমি পরিচালককে সর্বোচ্চে স্থান দিই এবং তার কাছাকাছি রাখি ক্যামেরাম্যানকে। আমার নায়ককে সবচেয়ে কম প্রাধান্য দিই।

প্রঃ ফিল্মে আপনি বিশেষভাবে কী খোঁজেন ?

উঃ এখন আমি অভিনয়ে এক নতুন চ্যালেঞ্জ খুঁজছি। যদি কোনো চিত্রনাট্য সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং উদ্দীপনা না আসে, তাহলে আমি সেই ছবি করব না। কিন্তু যখন একটি ভূমিকায় আমি অভিনয় করি, তখন সেই অভিনেয়-চরিত্রটিকে নিয়ে অনেক ভাবি। আমি ফিল্মি জগতের চটকদার মোহ ছেড়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করার, আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

প্রঃ আপনি আপনার অভিনয়-জীবন চালিয়ে যেতে চান ?

উঃ ফিল্ম হল প্রযোজকের মাধ্যম। আমি নিজেকে আরো তৈরি করতে চাই। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব এবং আমার আশা, চলচ্চিত্র আমাকে এ-ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। প্রথমে আমার বন্ধুরা ভেবেছিল, আমি হয়ত বেশিদিন অভিনয় করব না। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি নিশ্চয়ই আমার অভিনয়-জীবন চালিয়ে যেতে পারব।

প্রঃ সবশেষে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন রাখছি। রাজ বব্বরের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে



রাজ বব্বর

কিছু বলবেন কি ?

উঃ অনেকে অবশ্য এ-ব্যাপারে অনেকরকম কথা বলে থাকেন। তবে তা নিয়ে আমার কিংবা রাজ-এর কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা দুজনে পরস্পরকে ভালবাসি—এ নিয়ে নতুন করে আর কী বলার আছে ? অবশ্য প্রথম দিকে আমি খুব বিচলিত বোধ করতাম না এমন নয়। জানেনই তো, ফিল্মি জগৎ গুজব শুনতে খুব ভালবাসে ; অভিনেত্রীদের নিয়ে নানান মুখরোচক গল্প পেলে তো কথাই নেই। তবে আমার মনে হয় রাজ-এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাছাড়া তার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ককে অস্বীকার করার মতো বোকামি আমার নেই। আমি মনে করি, ভালবাসা এমনই জিনিস যা অর্জন করতে হয়। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়াও যায় না। নিজেকে নিজে বিলিয়ে দিলে তবেই আরেকজন মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায়।

আমাদের মনে হয়, স্মিতার এই কথা একজন সত্যিকারের জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানুষেরই কথা। রাজ এবং স্মিতার মধ্যে একটা সুন্দর সহজ বোঝাপড়া আছে, তাই এই সম্পর্ককে বোধহয় যথার্থ অর্থেই রোম্যান্টিক বলা যায়। রাজ-এর কাছেই স্মিতা হয়ত তাঁর সত্যিকারের বন্ধুত্ব খুঁজে পেয়েছেন। অবশ্য এটা রাজ-এর স্ত্রীর কাছে বড়রকমের ঈর্ষার উদ্রেক করে। আমাদের মনে হয় যা তিনি দিতে পারেননি, স্মিতার কাছে রাজ তা খুঁজে পেয়েছেন।

এস·এন·খোসলা

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান—যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক্‌ থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:
নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008





তৈরী করা খুব সোজা।



আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন। নেস্টাম মিশিয়ে নিন। এবার খেতে দিন।

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম

বেবি সিরিয়াল

দুধের সঙ্গে মেশান

SAA/FSL.N 3150 BEN

NESTLÉ.

বিচারকের আসনে আন্তর্জাতিক অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

টালিগঞ্জের চেনা পরিবেশ ছেড়ে সৌমিত্র হঠাৎ কেন আন্তর্জাতিক উৎসবে? তাঁর এই উপস্থিতির সার্থকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে দিয়েই শুরু হচ্ছে এই লেখা।

এখনো পর্যন্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক অভিনেতা। যাঁরা অভিনয় শিল্পকে ভালবাসেন, অভিনয় সম্পর্কে দেশবিদেশের নানান খবর রাখেন – এই কথাটা তাঁরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন। সারা পৃথিবীর বোধসম্পন্ন সিনেমা দর্শকের কাছে এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধি হতে পারেন সৌমিত্র। এই আসনে তিনি আছেন দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে। এ ক্ষেত্রে সৌমিত্রর পাশাপাশি একমাত্র আসতে পারেন জাপানের অভিনেতা তোশিরো মিফুনে, যিনি বিশ্ববিশ্রুত আকিরা কুরোসাওয়ার ষোলটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। একথা প্রায়ই বলা হয় – জাপানের বিশিষ্ট সত্তা, সেই দেশের দুর্বার অহঙ্কার ও প্রাণশক্তি, অভিমানের প্রচণ্ডতা – সবই মূর্ত হয়ে আছে তোশিরো মিফুনের অভিনয়ে। তেমনি বাঙালি তথা ভারতীয় মনের শান্ত সংবেদনশীলতা, বোধের গভীরতা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, দারিদ্র্যের সামনে দাঁড়িয়েও প্রেমে অবিচল আস্থা – সবই চিরকালের জন্য চিহ্নিত সৌমিত্রের অভিনয়ে। নানান শ্রেণী ও বিচিত্র মানসিকতার মানুষের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করায় যে অসীম ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন – পৃথিবীর সিনেমায় তা তুলনারহিত।

ছোট্ট একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে, আন্তর্জাতিক দর্শক মনে সৌমিত্র কতটা গ্রহণীয়। ডিসেম্বরের ১৫ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কাজ চলছিল। তখন সেখানে ছিলেন অ্যালাঁ রেনের সহকারিণী মারতিন্ আরমাঁ। সেই সময় মারতিনের দিল্লি হয়ে প্যারি ফিরে যাবার কথা। অথচ সত্যজিৎ রায়ের এতগুলো ছবি এক সঙ্গে দেখার অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে এই ফরাসিনী যাবার তারিখ পিছিয়ে দিলেন।

এডিটিং যন্ত্রে 'অপুর সংসার' বা 'অশনি সংকেত' দেখার সময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ছিলেন। ক্রমে আবিষ্কার হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি তাঁর চেনা। এবং সেই অভিব্যক্তি একজন বিদেশিনীর মনের সজাগ তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত করছে। চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত – সৌমিত্র তাঁর শিল্পকর্মে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত বাধা ও ব্যবধান কিভাবে অনায়াসে অতিক্রম করে গেছেন! তিনি সেই বিরল জাতের অভিনেতা, যিনি অনায়াসে দেশকালের বাধা ডিঙিয়ে যান। পৃথিবীর নানান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এক সার্বজনীন হৃদয় আছে, যার অস্তিত্ব সব দেশের সকল মানুষের মধ্যে। সৌমিত্রর অভিনয় আমাদের সেকথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

প্রকৃত অর্থেই সৌমিত্র একজন আন্ত-

নিউ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দশম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুরিদের মধ্যে রয়েছেন দিলীপকুমার (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়), উৎসব পরিচালক বীরেন [illegible] (বাম দিক থেকে চতুর্থ) এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সর্ব দক্ষিণে) ফটো শংকর চক্রবর্তী



র্জাতিক মানুষ। এবার দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম বিচারক ছিলেন তিনি। বিচারকের আসনে এমন একজন আন্তর্জাতিক শিল্পীকেই আমরা চাই। কিসের ভিত্তিতে সিনেমা বিশ্লেষণ করেছেন এই আন্তর্জাতিক শিল্পী, সেটা জানার ইচ্ছে স্বভাবতই আসে। কোনো পরিচালক যখন বিচারক, তখন তাঁর বিচার ও ভাবনার প্যাটার্নের সঙ্গে আমরা পরিচিত। পরিচালকরা সে কথা জানিয়েছেন নানান সাক্ষাৎকারে। কিন্তু বিচারক যখন সৌমিত্র, তখন কি ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি? তাঁর সিনেমা-বিশ্লেষণ কোথায় বিশিষ্ট? এমনই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েছিলাম স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে নানান আলোচনার মধ্যে স্ফটিকের মত ফুটে উঠল সৌমিত্রর দৃষ্টিকোণ।

উৎসবঃ সর্বজাগতিক মানুষের কল্পনা

কোনো বিদেশী ছবিকে সম্যক বুঝতে হলে সে দেশের সংস্কৃতির বিষয়ে একটা ধারণা করে নিতেই হয়। কোনো দেশের সংস্কৃতি থেকেই আমরা জানতে পারি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে সে দেশের মানুষের কি ধারণা! মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মানদণ্ডটি চিনলে তবেই জানা যায় কোনো বিশেষ ঘটনায় মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কী? সেই প্রতিক্রিয়াগুলো পরপর সাজিয়ে গড়ে ওঠে একটি চিত্রনাট্য।

কিন্তু সৌমিত্র জানালেন, চলচ্চিত্র উৎসবের ওই স্বল্প সময়সীমায় বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির বিষয়ে ধারণা করা অসম্ভব। সুতরাং সংস্কৃতির বিষয়ে ধারণাই যদি ছবি বিচারের একমাত্র ভিত্তি হয়, তবে ছবির সঠিক বিশ্লেষণ করা যাবে না। সৌমিত্রর ভাষায় – 'বিদেশ মানেই বোঝা না-বোঝা মিলিয়ে।'

এই প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল – বিদেশের এই 'না-বোঝা' দিকটা কতখানি বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিচারকের সামনে?

সৌমিত্র বললেন, বিদেশের ওই 'না-বোঝা' দিকটা নিয়ে বিচারকরা তেমন উৎকণ্ঠিত হন না। তার জায়গায় তাঁরা এমন এক দৃষ্টিকোণে স্থাপন করার চেষ্টা করেন নিজেকে, যে দৃষ্টিকোণ সর্বজাগতিক।

এবারে প্রশ্ন আসে – কি করে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা সম্ভব?

সৌমিত্র বললেন, এতগুলো দেশের বিচারক যখন বিভিন্ন মহাদেশের ছবির



ফটো : হীরক সেন

মুখোমুখি হন, তখন সবারই মনে স্বভাবতই গড়ে ওঠে এক ফান্ডামেন্টাল মানুষের ধারণা। সৌমিত্রর ভাষায়, 'সর্বজাগতিক মানুষের কল্পনা।'

বিভিন্ন সিনেমার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপট যতই বৈচিত্র্যময় হোক – এই সর্বজাগতিক মানুষের কল্পনার কোনো রূপান্তর নেই। মানুষের মূল উপাদানগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে এই সর্বজাগতিক মানুষ। আর সার্থক সিনেমা মাত্রই মানুষের বাস্তব অবস্থাকে চিহ্নিত করে, যা সৌমিত্রর ভাষায় – 'মানুষের সত্য অবস্থান।' যে ছবি এই সত্যকে চিত্রিত করে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক গন্ডিকে অতিক্রম করে – সেই ছবি তখন এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি জগতের অংশীদার। যে জগৎ একাই আলিঙ্গন করে গোটা পৃথিবীটাকে। এইভাবেই ভাল ছবির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতি। সেই ছবি দেখার সময় বিভিন্ন দেশের বিচারকের মনে কাজ করে এক সাধারণ বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি। তার মধ্যে দিয়েই একীভূত হন নানা জাতির নানান বিচারক।

সেই সর্বজাগতিক মানুষের কল্পনাকে পাথেয় করে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছবি বিশ্লেষণ হয় চলচ্চিত্র উৎসবে।

এইভাবেই পৃথিবী জুড়ে নানান উৎসব গড়ে তুলছে বিশ্বভ্রাতৃত্বকে, লালন করছে সর্বজাগতিক মানুষের কল্পনা।

এবারের উৎসব

এবারের ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে যে কটি ভারতীয় ছবি সৌমিত্র দেখেছেন, তার মধ্যে সত্যিকারের ভাল ছবি দুটি। একটি গৌতম ঘোষের 'পার', অন্যটি আদুর গোপালকৃষ্ণনের 'মুখাম্মুখম'। একঝাঁক বিদেশী ছবির মধ্যেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর গৌতমের 'পার'-এর চেয়ে ভাল ছবি। কিংবা আদুরের 'মুখাম্মুখম' যদিও সামাজিক বা রাজনৈতিক ছবি, তাও দুটি ছবিই মূলত কাহিনী-নির্ভর।

সেই প্রসঙ্গ ধরে সৌমিত্র বললেন, গল্প বলা ছবির যুগ প্রায় পুরোপুরি ফিরে আসছে আবার। শুধু ভারতের গৌতম কিংবা আদুর নয় – বিদেশের অন্য পরিচালকদের অধিকাংশই বেছে নিয়েছেন গল্পের মধ্যে দিয়ে বক্তব্য পরিবেশনের পথ। ষাটের দশক থেকে সত্তরের শেষ অবধি গল্পকে ভাঙার যে যুগ এসেছিল, সেই ফ্যাশন আজ বিলীয়মান।

'বস্টোনিয়ানস'ও 'রুথলেস রোম্যান্স' একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ছবি বলে বিবেচিত।

এদের মধ্যে দুটি বিস্ময়কর মিল আছে। দুটি ছবিরই গল্প একশ বছরের পুরনো। এছাড়া সমাজে নারীর মূল্য উভয় ছবিরই বিষয়। রুশ ছবিটিতে দেখানো হয়েছে, সমাজতন্ত্রের সাফল্যের আগে কিভাবে নারীকে ব্যবহার করা হত পণ্য হিসেবে। আর ব্রিটিশ ছবিটিতে আছে দুটি বিভিন্ন মানুষ কিভাবে একটি মানুষকে একসঙ্গে অধিকার করতে চায়। শতবর্ষের পুরনো দুটি সমাজচিত্রে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে চিরকালীন নারীমূর্তি এবং সমাজে তার আবহমান ভূমিকার কথা।

এর থেকেই বোঝা যায়, নিছক স্টাইল বা টেকনিকের জন্য নয়, ছবি দুটি বিচারকদের মন কাড়ার কারণ চিরকালীন বিষয় এদের উপজীব্য। ছবি দুটি শুধু পিরিয়ড পীস হিসেবেই সার্থক নয় – সেই সঙ্গে বিষয় গৌরবেও গরীয়ান।

শুধু বিষয়গৌরবের জন্য কোনো ছবিকেই পুরস্কৃত করা হয় না – একথাও বললেন সৌমিত্র। দেখতে হয়, শেষ পর্যন্ত সেই বিষয়টি কতখানি শিল্পরূপ নিল।

সৌমিত্র জানালেন, এমন ছবি এবারে ছিল না যাকে মাস্টারপীস বলা যায়। তেমনি কোনো ছবিতে এমন অভিনয়ও তাঁর চোখে পড়েনি যা মনে থেকে যাবে বহুদিন।

এক 'বস্টোনিয়ান্‌স্‌' ছবিতে ভেনেসা রেডগ্রেভের অভিনয় এর ব্যতিক্রম।

মূল উৎসবের ছবি দেখার বাইরে, এবারে বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে অভিনয়কলা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন সৌমিত্র। তাঁর মনে হয়েছে, পশ্চিমের দেশগুলি অভিনয়কলার রসগ্রহণে অনেক অগ্রসর। তাঁরা বিশ্বাস করেন, গল্পের নানান ঘটনায় চরিত্রের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলাই সিনেমায় অভিনয়ের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সৌমিত্রর ভাষায় ন্যারেটিভ, 'স্টাইলের ইন্টারপ্রিটেটিভ নেচারের বাইরেও অভিনয়ের অস্তিত্ব আছে।'

বিষয়টি স্পষ্টতর করতে কালোত্তীর্ণ তিনটি সিনেমা থেকে উদাহরণ দেওয়া দরকার। (১) কুরোসাওয়ার 'সেভেন সামুরাই' ছবিতে তোশিরো মিফুনে, (২) সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার'-এ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, (৩) বার্গম্যানের 'অটাম সোনাটা'য় লিভ উল্‌ম্যান। ওঁদের অভিনয়ের গুণে চরিত্রগুলো বিস্তৃত হয়েছিল সিনেমায় দেখানো কয়েকটা ঘটনার বাইরেও। সিনেমার বারো কি পনেরো রীলের সময়সীমায় গোটা জীবনটা যে বাঁধা পড়ে যায় না – এই সত্য ওঁরা বোঝেন। তাই চরিত্রকে ওঁরা বিস্তৃত করেছিলেন সিনেমার হাতগুনতি ঘটনার বাইরে। তাই ওই তিনটি ছবিতে তাঁদের অভিনয় শুধু ন্যারেটিভের ইন্টারপ্রিটেশন নয়, গল্পের সীমা-ছাড়ানো পূর্ণাঙ্গ চরিত্র।

শুধু পরিচালকের কাজটাই প্রধান করে দেখার যে প্রবণতা আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে আছে – সেই ফ্যাশন থেকে অনেক বিদেশীই মুক্ত। ভাল সিনেমার অন্যতম প্রধান উপাদান যে অভিনয় – এই সত্যকে এবারে দিল্লি উৎসবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এ বিষয়ে আলোচনারও একটা লক্ষ্য ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হয়েছে।

প্যারিসে আসন্ন সৌমিত্র-উৎসব

দিল্লি উৎসব শুরু হয়েছিল ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর 'জুল এ জিম' ছবি দিয়ে। দর্শকের সামনে ছবিটি উপস্থাপিত করেছিলেন ফরাসী অভিনেত্রী জাঁ মরো। উৎসব শেষ হল আর একটি ক্লাসিক দিয়ে। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে - বাইরে'। সমাপ্তি উৎসবের উপস্থাপক ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক দর্শকমণ্ডলীর কাছে তিনি নিবেদন করলেন ভারতীয় সিনেমার এই অনবদ্য মাস্টারপীস।

এরপরে সৌমিত্রকে আবার আমরা দেখতে পাব প্যারিসের পঁপিদু সেন্টারে। এ বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে রেট্রো-স্পেকটিভের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে। সেই বিরাট উৎসব শুরু হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বারোটি ছবি দিয়ে। ভারতের উদ্বোধক-শিল্পী হিসেবে সৌমিত্র ছাড়া আর কাকেই বা ভাবা যায়?



ফটো : সন্দীপ সিংহ

গৌতম ঘোষের অভিজ্ঞতায় দিল্লি উৎসবের দর্শক ও কর্তৃপক্ষ

কলকাতায় খবর এসেছিল, এবার ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় শ্রেষ্ঠ ছবি গৌতম ঘোষের 'পার'। তখনো ফেস্টিভ্যাল চলছে। তার মধ্যেই খবরটা রাজধানী থেকে ধাক্কা মেরেছে কলকাতায়। তখন থেকেই উৎসুক ছিলাম। কারণ, উৎসবের অগুনতি ছবির ভিড়েও মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ায় যে ছবি, সে ছবি দেখে উৎসবের দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কী হল – সে বিষয়ে কৌতূহল স্বাভাবিক। আরো একটা কারণ আছে এই কৌতূহলের। সেটা হল, ফেস্টিভ্যালের দর্শকদের একটা বিশেষ চরিত্র থাকে। তাদের মধ্যে সবসময়েই কাজ করে একটা উত্তেজনা। যে উত্তেজনার স্রোতে বেশ ভাল ছবিও ভেসে যায় কখনো কখনো। খুব কম সময়ের মধ্যে, অনেকগুলো দেশী-বিদেশী ছবি বিচার করার অধিকার পেয়ে দর্শকদের মনে জন্ম নেয় একটা স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য। যার নিচে কিছু ভাল ছবিও হারিয়ে যায়। এই উত্তেজনা ও ঔদ্ধত্যকে অতিক্রম করা সহজ নয় কোনো ছবির পক্ষেই। এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকরাও উৎসবের এই দুই পাঁচিলকে অতিক্রম করতে গিয়ে উৎকণ্ঠিত হন।

তাই গৌতম ঘোষ ফিরে আসার পরেই, তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম দিল্লির দর্শকদের কথা। আমার প্রশ্ন ছিল শুধুই তাঁর নিজের ছবির দর্শকদের বিষয়ে।

কারণ, একজন পরিচালকের পক্ষে দর্শকদের মানসিকতা বিচার করার সহজ রাস্তা আছে। তাঁর ছবির জটিল দৃশ্যগুলো গ্রহণ করার জন্য দর্শক কতটা তৈরি, সঠিক জায়গায় আবেগ তাঁদের স্পর্শ করছে কিনা – সেটা অন্ধকার সিনেমা হলের মধ্যে থেকেও বুঝে নেওয়া পরিচালকের কাছে একটা মজার খেলা।

'পার' চলাকালীন সিনেমা হলের অন্ধকার থেকে কেমন প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন, গৌতম সে কথা জানালেন ঃ দর্শক এবার মনোযোগী ছিল। 'পার' শুরু হবার পর থেকেই কোনোরকম বিরক্তি বা উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি। যে ভয়টা থাকে ফেস্টিভ্যালে।

তবে ছবি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে, দর্শক-প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন হেরফের হয়েছে। ছবির প্রথমার্ধে শ্রমজীবী হরিজনের চারজনের একটি দল খুন করে অত্যাচারী জমিদারের ভাই মোহন আগাশেকে। তারপরেই গোটা সিনেমা হলে হঠাৎই নেমে আসে একটা অবিশ্বাস্য থমথমে ভাব। নিজের আসনে কেউ যেন আর একটুও নড়াচড়া করছেন না। এর থেকেই গৌতম বুঝেছেন, এত সিনেমা দেখেও কতটা অক্লান্ত ছিলেন দিল্লির দর্শকরা। 'পার'-এর নাটকীয় মুহূর্তটি অনুভব করতে পেরেছেন অনায়াসে।

তবে দর্শকরা সবচেয়ে আপ্লুত হয়েছেন ছবির শেষ অংশে, যেখানে একপাল শুয়োরকে গঙ্গা পার করবার কাজটি বেছে নিতে বাধ্য হয় অনাহারক্লিষ্ট হরিজন দম্পতি। দর্শকরা দমবন্ধ করে দেখেছেন সেই দৃশ্য। তাঁদের দমবন্ধ অবস্থাটি বোঝা গেছে অন্ধকারেও, কারণ ওই দৃশ্য শেষ হবার পরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছে অনেক দর্শকের বুক থেকে। গৌতমের ভাষায় – 'দর্শকরা ভীষণ টেনস ছিল ক্রসিং-এর সময়।'

দিল্লি উৎসবের দর্শকরা যে শুধু স্টার দেখতে সিনেমা হলে আসেন না তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে 'পার' ছবি দেখার সময়। তাঁরা শুধু নাসির আর শাবানার অনবদ্য অভিনয়কেই তারিফ করেননি, আরেকজন অনন্য অভিনেতাকে খুঁজে নিয়েছেন দুই বিখ্যাত স্টার-এর পাশাপাশি। তাঁর নাম সুনীল মুখোপাধ্যায়। সুনীল এখনো বিখ্যাত নন সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে। তবুও এই জাত অভিনেতাকে চিনতে দর্শকের অসুবিধে হয়নি। এখানে দিল্লির দর্শকদের সিনেমাবোধের প্রশংসা করতেই হয়। তারার আলোয় তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়নি।

'পার' ছবির শো-এ দিল্লির দর্শকদের আরেকটা বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে। সেটা হল ছবির সঙ্গে তাঁদের ইনভলভ-মেন্ট। 'পার'-এর সঙ্গে আবেগের দিক থেকে এতটাই জড়িত ছিলেন তাঁরা যে শো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত অভিনন্দনে ছবিটিকে ভূষিত করেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের ভারতীয় দর্শক যাঁরা, তাঁদের উপর বিশ্বাস জন্মেছে গৌতম ঘোষের। কারণ, তাঁরা যে শুধু সিনেমা হলেই মনোযোগী তাই নয় – হলের বাইরেও একইরকম উৎসাহী। ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় 'গরম' দৃশ্য দেখার সুযোগ নেই জেনেও, তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। 'পার' প্রসঙ্গে গৌতম জানালেন – 'লোকে মারামারি করে টিকিট কেটেছে।'

বিদেশী দর্শকরা সামান্য বাধার সম্মুখীন হন ভারতীয় ছবি বুঝতে গিয়ে। যত সহজে আমরা বিদেশী ছবি বুঝতে পারি, ওরা তত সহজে বোঝে না আমাদের। গৌতমের ভাষায় – 'আসলে কিছু রেফারেন্স বুঝতে অসুবিধে হয় ওদের। যেমন আমাদের কাস্ট সিস্টেম। আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড নিয়ে যতটা জানি, ওরা আমাদের সোসাইটিকে ততটা বোঝে না। তাই আমরা ওয়েস্টার্ন ছবি অনেক বেশি এনজয় করি।.....ওরা কিন্তু ততটা এনজয় করতে পারে না আমাদের ছবি।'

কিন্তু মানবিকতার সার্বজনীন ভিত্তির ওপর যে ছবি রচিত, তা এই বাধা ডিঙিয়ে যায়। যেমন 'পার' দেখে হাওয়াই-ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন। ডাকসাইটে পরিচালক শ্লয়েনরফ কিংবা ফনট্রটের মত দুঁদে পরিচালক বলেছেন, আমরাও যেন গঙ্গার বুকে ভাসছিলাম ওই হরিজন-দম্পতির সঙ্গে। শুয়োরের পাল ভাসিয়ে, প্রাণ নিয়ে যখন ওপারে পৌঁছল হরিজন-দম্পতি তখন অজান্তে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছে এই দুই বিদেশী পরিচালকের বুক থেকেও।

তবে দর্শকদের মধ্যে সবাই যে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবি দেখেন এটা ভাবলে ভুল হবে।। পুনার কয়েকজন ফিল্ম-ছাত্রের মতে, ভারতীয় পরিচালকরা ক্রমাগত গল্প-নির্ভর ছবি করে করে পিছিয়ে পড়ছেন। ভারতীয় পরিচালকরা কেন যে সবাই রেনে বা গোদারের পথে হাঁটেন না – এটা বুঝে উঠতে পারেন না পুনার ছাত্র-ছাত্রীকুল। এ পুনা-সমাজ চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ অতিথি। রসোপলব্ধির মেলায় এই ফিল্ম-ছাত্রেরা স্বভাবসিদ্ধ উল্টোসুর ধরেন। দাবি করেন গল্পকে ভেঙে তছনছ করে দিতে হবে। তারপর অন্য কথা।

এর উত্তর দেওয়া যাক গৌতম ঘোষের নিজের ভাষায় – 'গল্পকে ভাঙার পথিকৃৎ আমরা কাকে বলি ? ব্রেখটকেই তো! সেই ব্রেখট নিজেই যখন একটা সিনেমা করলেন, তখন কিন্তু গল্পকে ভাঙেননি। ছবির ঘটনা থেকে দর্শকদের অ্যালিয়েনেট করেননি।..... আসলে সিনেমা হলে, অন্ধকার কালো ফ্রেমে মোড়া এনলার্জড ভিস্যুয়ালের একটা নিজস্ব অ্যালিয়েনেশনের ক্ষমতা আছে। ব্রেখট 'কুলে ভাম' ছবি করার সময়েই এই রিয়ালাইজে-শনে পৌঁছেছিলেন, এত বছর আগেও। সিনেমায় গল্পকে ভেঙে অ্যালিয়েনেট করার প্রয়োজনই পড়ে না – যেটা নাটকে ভীষণ প্রয়োজনীয়।.....আমি এটা বিশ্বাস করি। তাই 'পার'-এর চিত্রনাট্য লেখার সময় গল্পের কনটিনিউটি একেবারে ভেঙে দিইনি।.....'

গৌতম মনে করেন, চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিলে বোঝা যায়, ভাল ছবি দেখার জন্য প্রচুর দর্শক এখন ভারতে তৈরি। তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন না এই উৎসব সার্থক। তার জন্য প্রধানত দায়ী সত্যিকারের ভাল ছবির অভাব। ছবি নির্বাচনের কাজে কোথাও একটা বড় গলদ আছে। সেই গলদটা দূর করতেই হবে।

আরো একটা বড় সমস্যা আছে গৌতমের মতে। সেটা হল, বিদেশ থেকে বড় বড় ছবির ক্রেতারা আর আসছেন না ভারতের উৎসবে। তাই ভারতীয় উৎসব থেকে ছবি প্রায় বিক্রি হয় না বললেই চলে। শুধু উৎসবে অন্তর্ভুক্তির সম্মানটাই তো আর পরি-চালকের শেষ উদ্দেশ্য নয়। যদি ছবির প্রসারের পরিধি বিস্তৃত না হয় – তাহলে উৎসবের লক্ষ্য অনেকটাই ব্যর্থ।

এই কারণেই, বিদেশ থেকে কোন ভাল পরিচালকের ভাল ছবিও আর বিশেষ আসে না ভারতের ফিল্মোৎসবে। ভারতের উৎসবে ছবি পাঠালে ছবির আর্থিক-ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়।

গৌতম ঘোষ মনে করেন, উৎসবে ভাল বিদেশী ছবিকে আকর্ষণ করতে গেলে, বড় বড় ক্রেতাকে টেনে আনতে হবে আগে। তবেই আসবে বড় বড় পরিচালকের ছবি। যেমন কান টানলে মাথা আসে।

কর্তৃপক্ষ এখনই যদি এই উৎসবকে একটা বৃহৎ বিপণনের ক্ষেত্র করে তুলতে না পারেন – তাহলে ভারতীয় ফিল্মোৎসব ক্রমেই আরো রক্তাল্পতায় ভুগবে।

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ ঘরে-বাইরে

সত্যজিৎবাবু তাঁর সুনামের প্রতি অবিচার করেছেন

যেহেতু সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের ফসল, সম্পূর্ণ ছবিটি তিনি নিজের হাতে শেষ করতে পারেননি এবং এই ছবি সম্পর্কে দর্শকসমাজের একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে সেহেতু ছবিটির নিরপেক্ষ সমালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুজনের ওপর। গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল একটি সমালোচনা, এ সংখ্যায় অন্যটি প্রকাশিত হল।

—সম্পাদিকা

'ঘরে-বাইরে' রিলিজ হয়েছে বেশ কয়েকটা দিন হয়ে গেল। অনেকেই ছবিটা দেখে ফেলেছেন। যার মধ্যে আমিও একজন। আবার অনেকেই আছেন যাঁরা ছবিটা দেখবেন ভাবছেন। সত্যজিৎ রায়ের অন্য ছবি যখন রিলিজ হয়েছিল, তখন প্রায় সব পত্রপত্রিকাতেই প্রশংসার কথাই বেশি ছিল। কিন্তু এবারে তা হয়নি। বরং বিরূপ সমালোচনাই বেশি।

যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁরা অনেকদিন ধরেই একাজ করছেন। অনেকেরই ফিল্ম ক্রিটিক হিসাবে অভিজ্ঞতা অনেকদিনের। তাই আমি চেষ্টা করেছি সাধারণ মানুষের মতামত নিতে। জানতে চেয়েছি—'ঘরে-বাইরে' ছবিটি তাঁদের কেমন লাগল। প্রায় সকলেই বলেছেন—ছবিটি তাঁদের ভাল লাগেনি। অনেকে বলেছেন—'ঘরে-বাইরে' দেখতে দেখতে মনেই হয়নি সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখছি।

শেষে যে বক্তব্য রাখা হল আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। সত্যজিৎবাবুর ছবি দেখলে মনটা তৃপ্তিতে ভরে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। বরং মনের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয়েছে 'ঘরে-বাইরে' তৈরি না হলেই ভাল হত।

একথা বলার কারণ ছবির বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ যখন 'ঘরে-বাইরে' লিখেছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছিল। এবং ওই সময়ে হিন্দুরা মুসলমানদের ওপরে অত্যাচার করতেন। মেয়েরা পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, বাইরেও বেরোতে পারতেন না। তাই 'ঘরে-বাইরে' চরম ভাবে সার্থক হতে পেরেছিল। কিন্তু আজ ওগুলির কোনটাই নেই। তাই 'ঘরে-বাইরে' ছবি হওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সকলেই চেষ্টা করেন ত্রুটিকে খুঁজে বার করে তা শোধরাতে। কিন্তু ত্রুটি শুধরে ফেলার পর তা নিয়ে আলোচনা মানেই সময়ের অপচয়। এই দৃষ্টি নিয়ে দেখতে গেলে 'ঘরে-বাইরে' এক বিরাট অপচয়।

যদি ধরে নেওয়া যায় সত্যজিৎবাবু 'ঘরে-বাইরে' তৈরি করেছেন সেই সময়টাকে ধরে রাখার জন্য, তাহলে বলব—নিশ্চয়ই এটা একটা ভাল প্রচেষ্টা। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'তে কি তা করা হয়েছে? মোটেই না। সেই সময়ের একটা ভগ্নাংশকেই ছবিতে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাও অনেকটাই বিকৃত করে। যা থেকে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভুল ধারণা জন্মানোর যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

গল্প সম্বন্ধে যা বলার ছিল তা বললাম। এবারে আসা যাক বিভিন্ন দৃশ্যের খুঁটিনাটির বিষয়ে। যা সত্যজিৎ রায়ের ছবির এক বিরাট সম্পদ। এবং যার জন্যই তিনি আন্তর্জাতিক মানের পরিচালক।

প্রথমেই বলা যাক সেই দৃশ্যটির কথা, যে-দৃশ্যে বিমলা অনেকগুলি পোশাক পরে পরে দেখছেন তাঁকে কেমন মানাচ্ছে। একটা পোশাক খুলে অন্যটা পরতে যতটুকু সময় লাগার কথা তা ছবি দেখে বোঝা যায়নি। মনে হয়েছে এক-একটা পোশাক পরতে মিনিট খানেক লাগছে। অতগুলি পোশাক না পরিয়ে দুটি পরালেই চলত। এবং ভেতর থেকে কিছু কথা বিমলাকে দিয়ে বলালে মনে হত না একটা পোশাক খুলে অন্যটা পরতে এক মিনিটও লাগছে না।

এর পরে আসা যাক, সৌমিত্রর পোশাকের ব্যাপারে। তিনি বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কথা বলেছেন। অথচ নিজে ধুতি বা পাঞ্জাবি যা পরেছেন তা খদ্দর নয়। তার মানে সেই সময় অনুযায়ী ওগুলি বিদেশী। আসলে যে কাপড়ে সৌমিত্র অর্থাৎ সন্দীপের পাঞ্জাবি বানানো হয়েছে তা আমাদের দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং ওই কাপড়ে পলিয়েস্টার সুতো আছে। যা সেই সময়ে বিদেশেও তৈরি হত না। তাহলে ওই সময়কার দৃশ্যে ওই কাপড় এল কেন? তাছাড়াও সন্দীপ যেমন বিদেশী সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতার কথা বলেছেন তেমনি বিদেশী কাপড় সম্বন্ধেও তাঁকে দিয়ে কিছু বলানোর দরকার ছিল।

পোশাকের পরেই বলতে হয় শব্দের বিষয়ে। তিনটি দৃশ্যে শব্দের গন্ডগোল রয়েছে। প্রথমেই আসা যাক নাটমন্দিরের সভায় সন্দীপের বক্তৃতা দেওয়ার প্রসঙ্গে। হলটা বেশ বড়। লোকও অনেক হয়েছিল। সন্দীপ খালি গলায় বললেন এবং সকলেই শুনতেও পেলেন। বিষয়টাকে মেনে নিতে মন চায় না। তবুও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু যখন ক্যামেরা সন্দীপ থেকে দূরে গেছে তখন বক্তৃতার আওয়াজটাকে কমানোর দরকার ছিল। কারণ দূর থেকে অতটা ভাল শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়। সব থেকে খারাপ লেগেছে দোতলায় থেকে বিমলাও একই রকম আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন।

এর পরের দৃশ্য হচ্ছে হাট। ওখানেও সন্দীপ যখন বক্তৃতা করেছেন, তখন অনেক দূরে বসেও সকলেই সমান শুনেছেন। কাছের লোক এবং দূরের লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনি। বক্তৃতার দৃশ্যগুলিতে বক্তার গলার আওয়াজ সরাসরি রেকর্ডিং না করে বারবারই মনে হয়েছে কোন সাউন্ড বক্স থেকে রেকর্ডিং করা হয়েছে। এর ফলে আওয়াজটা জোর হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা নষ্ট হয়ে গেছে।

শব্দের প্রসঙ্গ শেষ করব বাগানের মধ্যে মুসলমানদের সভার কথা বলে। বক্তা খালি গলাতেই বলছিলেন। কিন্তু নিখিলেশ অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেয়েছেন। বক্তা যদি চিৎকার করে বলতেন, তাও খানিকটা শোনার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু তিনি বেশ আস্তেই বলছিলেন। যাতে বিষয়টা গোপন রাখা যায়। অথচ নিখিলেশ দূর থেকেও শুনতে পেলেন।

শব্দের পরে বলব আলোর বিষয়ে। আলো অনেক জায়গাতেই ঠিক নেই। তবে সব থেকে খারাপ লেগেছে নিখিলেশ এবং বিমলা যখন বিছানায় শুয়ে কথা বলছেন। মাথার কাছে একটা আলো কমিয়ে রাখা ছিল। তার আলো কোথায়ও দেখাবার চেষ্টা করা হয়নি। দেখানো হয়েছে চাঁদের আলো। চাঁদের আলোতে মশারির মধ্যে যেভাবে দুজনকে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে তা কখনই দেখা সম্ভব নয়। এর থেকেও যেটা বড় কথা, তা হল—নীল আলো; যা দিয়ে জোছনা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তার ফোকাস ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

এবারে বলব মোহরের কথা। ছবিতে সেটা দেখানোর জন্য সত্যজিৎ রায়কে তা তৈরি করতে হয়েছে। কোন জিনিস নতুন থাকলে তা চকচকে হবেই। কিন্তু ওগুলি দেখানোর সময় সত্যজিৎবাবুর উচিত ছিল বাস্তব দিকটা ভাবার। যে সময়ে মোহরগুলি দেখানো হয়েছে, তখন সেগুলি অনেকটাই মলিন হয়ে যাওয়ার কথা। কারণ তখন নতুন করে মোহর তৈরি হচ্ছিল না। ওগুলি জমিদার বাড়ির অনেকদিনের সংগ্রহ।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বনের দৃশ্য দেখানো হবে কিনা তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই বিতর্ক চলছে। সত্যজিৎবাবু মত দিয়েছিলেন—ছবির প্রয়োজনে চুম্বনের দৃশ্য নিশ্চয়ই রাখা উচিত। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'তে যে তিনটি চুম্বনের দৃশ্য এসেছে, তা দৃশ্যের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। কারণ পরিস্থিতি ওইরকম একটা দৃশ্যের জন্য মোটেই তৈরি করা হয়নি।

প্রথম যে দৃশ্যটায় বিমলাকে সন্দীপ চুম্বন করল তা দৃশ্যের সঙ্গে খুবই বেমানান লেগেছে। একটি ছেলে এবং মেয়ে যখন একে অপরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন প্রথমে আলিঙ্গনের পালাই আসে। পরে তা চুম্বনের পর্যায়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রথমেই চুম্বনের চিন্তা মাথায় আসে

না। বিশেষ করে দুজনে যদি একটা ফাঁকা ঘরে থাকে। এবং একে অপরকে যদি প্রথমবার স্পর্শ করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় চুম্বনের দৃশ্যও তৈরি করা হয়েছে সন্দীপ এবং বিমলাকে দিয়ে। এবারেও মনে হয়েছে এর কোন প্রয়োজন ছিল না তৃতীয় দৃশ্যের বেলায়ও একই কথা বলতে হয়। মনে হয়েছে বিমলাকে নিখিলেশ চুম্বন করল, যেহেতু সন্দীপ দুবার করেছে

যেমন চুম্বনের দৃশ্যগুলির জন্য বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি করা হয়নি, তেমনি বিমলার সন্দীপের প্রেমে পড়াটাও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঘটেনি। একজন বিবাহিতা মেয়ে শুধু একটা বক্তৃতা শুনে প্রেমে পড়ে যাবে তা মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে স্বামী যখন বক্তৃতার প্রসঙ্গটা একেবারেই পছন্দ করেন না। ছবি দেখে মনে হয়েছে বিমলা প্রেমে পড়বে বলে সন্দীপের জন্য অপেক্ষা করছিল।

এবারে শেষ দৃশ্যের কথা বলে লেখা শেষ করব। ওই দৃশ্যটায় দেখা গেল একদল লোক পালকিতে করে নিখিলেশের মৃতদেহটা নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে। এবং ওই দৃশ্যটা দেখা গেল জানালা দিয়ে শুটিং করার ফলে। এর আগে জানালা যখন দেখানো হয়েছে তাতে প্রচুর পর্দার ব্যবহার নজরে পড়েছে। কিন্তু শেষ দৃশ্যের বেলায় দেখা গেল জানালায় কোন পর্দা নেই। পর্দাগুলি কি নিখিলেশের মৃত্যুসংবাদ শুনে খুলে নেওয়া হয়েছিল ? নাকি ওটা একটা অন্য বাড়ি !

আমার মনে হয় ওটা অন্য একটা বাড়ি। তা নাহলে ওই বাড়িটাকে এর আগে কোন দৃশ্যে বাইরে থেকে দেখানো হত। আগে কখনই বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখানো হয়নি। মনে হয় যে বাড়িটার ভেতরে শুটিং হয়েছিল, তার বাইরেটা দেখতে ততটা ভাল নয়। মৃতদেহ আনার সময়ে বাড়ির যে সুন্দর বাগান দেখানো হয়েছে, ওই বাড়িটাতেই শুটিং হলে তা আগেও নিশ্চয়ই সত্যজিৎ রায় দেখাতেন।

মৃতদেহ আনার দৃশ্যটা নিশ্চয়ই অন্য কোন বাড়িতে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ শেষ দৃশ্যে এসে বাড়িটাকে বদলে দেওয়া হয়েছে। যা সাধারণ ফিল্মের ক্ষেত্রেও ভাবা সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তা করেছেন।

এতক্ষণ যা বললাম তার পরিপ্রেক্ষিতে বলব—সত্যজিৎবাবু তাঁর সুনামের প্রতি অবিচার করেছেন। এতগুলি ভুল নিয়ে তাঁর হাত থেকে ছবি বেরিয়ে আসবে তা একেবারেই ভাবা যায় না। অপ্টিমাম স্টেজে পৌঁছে গেলে ডিকেয়িং শুরু হওয়ারই কথা। সত্যজিৎ রায় শুরু করেছিলেন অপ্টিমাম দিয়ে। কারণ পথের পাঁচালী যে কোন পরিচালকের ক্ষেত্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এর প্রতিটি দৃশ্যেই পরিচালকের পূর্ণ বিকাশের ছাপ ছিল। এবং তা একেবারেই অপ্টিমাম পর্যায়ের। যার ফলেই সত্যজিৎবাবু পৃথিবীর অনেক মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন।

অপ্টিমাম দিয়ে শুরু করার ফলে সত্যজিৎবাবুর লাভ হয়েছে। রাতারাতি তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে লোকসানও হয়েছে। পথের পাঁচালীর পর থেকেই তাঁর ছবির মান পড়তে শুরু করেছে। যেমন মহানগরের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে।

অফিসে আসার জন্য মাধবী ভবানীপুরের একটা ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা ট্রাম এল বেশ ফাঁকা এবং তিনি তাতে উঠেও পড়লেন। ভবানীপুরে যাঁরা থাকেন তাঁরা জানেন যখন জওহরলাল নেহরু রোড ধরে ট্রাম যাতায়াত করত, তখন ভবানীপুরে এলে তার চেহারা কেমন থাকত। অফিসের সময় তাতে তিলধারণের জায়গা থাকত না। কিন্তু সত্যজিৎবাবুর নায়িকা ফাঁকা ট্রামই পেয়েছিলেন।

কিন্তু গুণগত মান কমতে থাকলেও সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এমন অনেক কিছু থাকত যার ফলে মনে হত, সত্যজিৎবাবুর ছবি দেখলাম। সেটুকুও 'ঘরে-বাইরে' দিতে পারল না। মনে হল না—তাঁর ছবি দেখলাম।

সত্যজিৎ রায়কে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই বলব—সুনাম বজায় থাকতে থাকতে তাঁর অবসর নেওয়া উচিত। 'ঘরে-বাইরে'র মত আর একটা এমনি ছবি তিনি যদি করেন, তাহলে আমার মত অনেকের মনে যে শ্রদ্ধার আসনটি তাঁর জন্য রাখা আছে, তা আর থাকবে না। আর তিনি যদি তা না করেন তাহলে আমি চাইব, সময় অনেক লাগলেও যেন তিনি আর একটা পথের পাঁচালী আমাদের উপহার দেন।

অশোক চৌধুরী



‘আমরা আজ ব্যস্ত শিল্পী’ – অনুপ জালোটা

প্রঃ সংগীতকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন কেন?

উঃ আমার বাবা একজন বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ছিলেন কিন্তু আমার ভাইবোনেরা কেউই তাঁর পেশা গ্রহণ করেনি। আমি যখনই বাবার কোনো অনুষ্ঠানে গেছি তখনই সংগীতশিল্পী হওয়ার প্রবল ইচ্ছা মনে জেগেছে। ভাতখন্ড সংগীত শিক্ষায়তনে আমি আমার শিক্ষা সমাপ্ত করে বম্বে এসেছিলাম। এখানে এসে প্রথমে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সমবেত গায়কদের দলে যোগদান করি। তারপর বহু কষ্ট ও সাধনার মধ্যে দিয়ে আজ এখানে পৌঁছেছি।

প্রঃ ছায়াছবিতে কাজ করতে ভাল লাগে?

উঃ এ পর্যন্ত ছায়াছবির জন্য মাত্র চারটি গান রেকর্ড করেছি। তবে আমি চলচ্চিত্রের পার্শ্বগায়ক হতে চাই না। প্রায় সবসময়ই আমি নিজের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকি, যার ফলে প্রায়ই আমাকে শহরের বাইরে যেতে হয়, তাই আমার পক্ষে ফিল্মে গান করা খুবই মুশকিল। অবসর সময় ছাড়া আমি ফিল্মি গানের রেকর্ড করতে পারি না।

প্রঃ ফিল্মে আপনি কী ধরনের গান গেয়েছেন?

উঃ সাধারণত গজল, ভজন বা ক্লাসিকাল ধরনের গান।

সাম্প্রতিককালে ভজন ও গজল গেয়ে যাঁরা সংগীতজগতে নিজেদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনুপ জালোটা নিঃসন্দেহে সেই গায়কদের অন্যতম। তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর ভজনের রেকর্ড প্লাটিনাম অনার পায়।

পারিবারিক ধর্মীয় পরিমন্ডল তাঁকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল সংগীতশিল্পী হতে। কিন্তু নিরন্তর শিল্পের সাধনা তাঁকে এনে দিয়েছে খ্যাতি। বর্তমান সাক্ষাৎকারে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির অজানা দিকগুলি আলোকিত হয়েছে, বহু কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি সহজভাবে।

প্রঃ জীবনের এমন কোনো ঘটনা মনে পড়ে কি, যা আপনাকে সংগীতশিল্পী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

উঃ আমার বাবা-মা দুজনেই ধার্মিক ছিলেন। বাবা বেশিরভাগ ভজন গাইতেন। মনে আছে, একবার বাবা হনুমানজীর গুণগাথার ভজন গাইছিলেন। আমারও বাবার সংগে গাইবার কথা ছিল কিন্তু ভজন শুনে আমি এতই মোহিত হয়েছিলাম যে আমার দু'চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ছিল, কিছুতেই গান গাইতে পারিনি।

প্রঃ আপনার কিছু অনুরাগী ভক্তের ধারণা, স্টেজে আপনার শোম্যানশিপ অনেক সময়ই অনুষ্ঠানের ক্ষতি করে। এ ব্যাপারে আপনার কি মত?

উঃ যে-কোনো অনুষ্ঠানের সময় আমার লক্ষ্য থাকে যাতে আমার গান সকলের কাছে পৌঁছয়। প্রতিটি শ্রোতা যেন আমার গান উপলব্ধি করতে পারেন। স্টেজে শোম্যানশিপেরও প্রয়োজন আছে। গানকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেশন করতে গেলে একটু আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় বইকি। আমি যেভাবে বাড়িতে বসে গান করি সেভাবে স্টেজে গাইলে, হলফ করে বলতে পারি ১% শ্রোতাও তা পছন্দ করবেন না।

প্রঃ আপনি যখন ভজন গান, তখন মাঝে মাঝে গান থামিয়ে অর্থ বিশ্লেষণ করেন। এর কি প্রয়োজন আছে?

উঃ বেশিরভাগ পুরনো ভজনই ব্রীজ ভাষায় রচিত যা অনেক শ্রোতাই বুঝতে পারেন না। তাই মনে হয় গানের বাণীটা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য।

প্রঃ সঙ্গীতে বাণীর তাৎপর্য কতখানি?

উঃ গীত, গজল আর ভজনের ক্ষেত্রে বাণী নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পী সুরের মাধ্যমে বাণীকেই তো পৌঁছে দেয় শ্রোতাদের কাছে। শ্রোতারা যদি গানের অর্থই না বুঝলেন তাহলে অর্ধেক আনন্দই মাটি।

প্রঃ গজল এবং ভজনের মধ্যে কোনটা আপনার বেশি পছন্দ?

উঃ অবশ্যই ভজন। ছোটবেলা থেকে আমি ভজনের পবিত্র পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি। লক্ষ্ণৌ-এ থাকার ফলে আমার গজলের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। লক্ষ্য করেছি, শ্রোতারা ভজন অনেক বেশি গ্রহণ করে। অবশ্য অনুষ্ঠানে নানা রুচি এবং পছন্দের অনুরোধ আসে। 'শরাবী' গান তো আজকাল খুব পছন্দ করছেন সকলে। ওই ধরনের গান গাইতে আমার কোনো আপত্তি নেই, যদি গানের কথা খুব অমার্জিত না হয়।

প্রঃ অনেকে বলেন, আপনি যখন গজল গান, তখনও মনে হয় যেন ভজন গাইছেন।

উঃ এই সমালোচনা ঠিক নয়। ভজনের পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে গজলের রোমান্টিকতার কোনো তুলনাই হয় না। আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন আমি গানের প্রতিটি লাইন বারবার গাই, যতক্ষণ না কথার প্রকৃত ভাবটি ফুটে উঠছে। যে কোনো সফল গজল গায়কই গানের ভাব বিনিময় দ্বারা শ্রোতাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এটা অবশ্য ভজনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই কারণেই হয়ত ওই ধরনের সমালোচনা আপনি শুনেছেন। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়, মেহেদি হাসান গজল পরিবেশনের সময় একই লাইন বারবার করে গান। আমি যখন 'রঙ দে চুনারিয়া' ভজনটি গাই তখন অনেকে একে গজল ভেবে ভুল করেন। সেইজন্যই হয়ত ওই সমালোচনার সম্মুখীন হই।

প্রঃ আপনি যখন কোনো রেকর্ড করবেন মনে করেন তখন কীভাবে গীত, গজল আর ভজন নির্বাচন করেন?

উঃ আমি সেসব গানই নির্বাচন করি যার বাণীর মধ্যে মাহাত্ম্য আছে। খুব খেলো কথা দিয়ে তৈরি কোনো গান কখনোই বাছি না। গানের মানে যাতে মোটামুটি সকলে বুঝতে পারেন সেদিকেও খেয়াল রাখি। আজকাল তো স্কুল-কলেজে উর্দু পড়া উঠেই গেছে, এমনকি লক্ষ্ণৌ-তেও উর্দুর তেমন চল নেই। গানের সুরটা কথার ওপরেই নির্ভর করে।

প্রঃ আপনার কি মনে হয় গজলের সঙ্গে গিটারের ব্যবহার উপযুক্ত?

উঃ হ্যাঁ। ভায়োলিন পশ্চিমী যন্ত্র হলেও ভি. জি. যোগ তাতে ভারতীয় রাগ বাজিয়েছেন। ব্রীজভূষণ কাবরাও একইভাবে হাওয়াইয়ান গিটার ব্যবহার করেছেন। স্প্যানিশ গিটার শুধু পপ সঙ্গীতের জন্য – এ ধারণাও ঠিক নয়। সন্তুরের মতোই গিটার ছন্দকে বাড়িয়ে তোলে। তাই আমি সবসময় একটা গিটার ব্যবহার করি আমার গানের সঙ্গে।

প্রঃ পুরনো কী কী রেকর্ড আছে আপনার?

উঃ প্রথমত গজল, আর ভজন তো আছেই। ইতিমধ্যে মেহেদি হাসান গজলকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন, সেই সঙ্গে জগজিৎ সিং এবং গুলাম আলিও। আমার তৃতীয় এল. পি. রেকর্ডটি ছিল গজলের। এরপরই 'ভজন সন্ধ্যা' রেকর্ডটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। এটাই প্রথম ভজনের রেকর্ড যা প্লাটিনাম অনার পায় এবং প্রায় দশ লাখ রেকর্ড বিক্রি হয়। আমার অন্য যে দুটো রেকর্ড প্লাটিনাম অনার পায় সেগুলো হল 'ভজন গঙ্গা' এবং 'গজল ফরমায়েশ'।

প্রঃ যেসব ছবির গান জনপ্রিয় হয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনার কী মত?

উঃ সত্যি বলতে কি, ছায়াছবির গান বেশিরভাগই নিচু মানের। তার জন্য সঙ্গীত পরিচালকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ছবিতেই তাঁদের বিশেষ কিছু করার সুযোগ থাকে না। 'তানসেন' বা 'বৈজু বাওরা'-র মতন ছবি আর হচ্ছে কই? সুযোগ পেলেই যে সঙ্গীত পরিচালকরা ভাল কিছু করতে পারেন তার প্রমাণ দিয়েছেন খৈয়াম, 'উমরাও জান'-এ। রাহুল দেববর্মণও 'রয়না বীত যায়ে'-র মতো গানে সুর দিয়েছেন 'অমর প্রেম'-এ।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন, এখনকার যেসব জনপ্রিয় গান নিয়ে যুবসমাজ মাতামাতি করছেন, তার ফলে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা ব্যাহত হচ্ছে?

উঃ অবশ্যই। আমার মতো কিছু শিল্পীকে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে যুবসমাজকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকে টেনে আনতে। আশার কথা, ছায়াছবির পার্শ্বগায়কদের চেয়ে আমরা আজ অনেক বেশি ব্যস্ত শিল্পী। আমার অবশ্য একটা সমস্যা আছে – সাধারণত শিক্ষিত এবং জ্ঞানীগুণী শ্রোতারাই ভজন পছন্দ করেন কিন্তু গজলের ক্ষেত্রে সেটা সবসময় হয় না। তাই ভারসাম্য বজায় রাখতে আমি আমার অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে গজল পরিবেশন করি, দ্বিতীয় পর্বে ভজন গাই। শতকরা নব্বইজন গজলের শ্রোতা ফ্যাশন ভেবে গজল শুনতে আসেন কিন্তু ভজনের শ্রোতারা একশভাগই খাঁটি সঙ্গীতরসিক।

প্রঃ আন্তর্জাতিক বাজারে চলার জন্য কোনো রেকর্ড করার পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ আমেরিকা থেকে একটা প্রস্তাব পেয়েছি ভজনের রেকর্ড করার, তবে এখনো কিছু ঠিক হয়নি। এতদিন পর্যন্ত ভারতের যন্ত্রসঙ্গীতই বিদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আমার চেষ্টা হবে ভজনকে জনপ্রিয় করে তোলা।

প্রঃ চলচ্চিত্রে অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেওয়ায় ইচ্ছা আছে কি?

উঃ না, সেরকম কোনো ইচ্ছা নেই। 'প্যার কা রিশতা'-য় আমি অভিনয় করি, কারণ কনক মিশ্র যখন আমাকে গায়কের চরিত্রটির কথা বলেন তখন আমার ভাল লেগে যায়। 'চিন্তামণি সুরদাস'-এ আমি তানসেন চরিত্রে রূপদান করছি। ওই ছবিতে আমার একটা গান প্লেব্যাক করেছেন যেসুদাস।

প্রঃ বর্তমানের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক কারা?

উঃ শুধু দুজন – জয়দেব এবং নৌশাদ।

প্রঃ কোন কোন সঙ্গীতশিল্পী আপনাকে প্রভাবিত করেছেন?

উঃ মেহেদি হাসান, গুলাম আলি এবং জগজিৎ সিং। জগজিৎ সিং-এর আধুনিক ছোঁয়া গজল সকলের মন জয় করেছে। গুলাম আলির ক্লাসিকাল ঘেঁষা গানগুলো এসেছে তান, আলাপ আর সরগম থেকে। মেহেদি হাসান একই লাইন বারেবারে গেয়ে শ্রোতাদের কাছে গানের প্রতিটি কথার অর্থ পৌঁছে দেন। জগজিৎ সিং-এর সঙ্গে আমার বহুকালের আলাপ, এখনো সময় পেলেই ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

প্রঃ আপনার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উঃ পাঁচ বছর আগে আমি সোনালিকে বিয়ে করি। ও সঙ্গীতের পূজারী, তাই আমার সঙ্গে মনের দিক দিয়ে মিল হয়েছে। ওর গজলের প্রথম অ্যালবাম রেকর্ড বেরোবে ফেব্রুয়ারি মাসে। সোনালি হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের ছাত্রী, তাছাড়াও সে ওস্তাদ ফৈয়াজ আহমেদ খানের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখছে। জীবনসঙ্গিনী পাওয়ার ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান। আমি সুখী হব যদি আমার দুই সন্তানও সঙ্গীতকেই বেছে নেয়।

অনিল পরেদি

ফটো : দীপক ঘোষ



কেমন করে সংগীতশিল্পী হলাম



বনশ্রী সেনগুপ্ত

হুগলী জেলার সদর সহর চুঁচুড়াতে 'মাতৃমন্দিরে' আমার জন্ম। আমাদের বিশাল বাড়ির পরিবেশটাই ছিল সংগীতমুখর। বাড়ির সবাই গানবাজনা করতেন। বাবা শৈলেন রায় ছিলেন প্রয়াত শচীন দেববর্মন ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র। কালক্রমে ডাক্তারি পেশাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁর গানবাজনার বাসনা অপূর্ণ রয়ে যায়। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল মেয়ে বনশ্রীকে অসাধারণ সংগীতসাধনায় তৈরি করে ভারতব্যাপী খ্যাতিসম্পন্না এক উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী হিসেবে দেখে যেতে। কাকা বৈদ্যনাথ রায়ও একজন উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী। যিনি পরে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হয়েছিলেন এবং কালক্রমে স্বাধীনভাবে একটি ছবিতেও সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। এখনও তিনি কলকাতার একটি সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং সংগীত শিক্ষাদানে ব্রতী আছেন। অন্যান্য কাকা এবং ভাইবোনেরা সকলেই গানবাজনা করেন। পিসিমা ইন্দুপ্রভা দেবী ছিলেন একদা বিখ্যাত গীতিকার, যাঁর লেখা গান এককালে অনেকেই রেকর্ড করেছেন। আমাদের বাড়িতে মাঝে-মাঝে বাবা সংগীত সভার আয়োজন করতেন এবং তাতে পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং অন্যান্য বিখ্যাত সাধকরা গান করতেন।

এমনি সুন্দর একটি পরিবেশে স্বভাবতই আমার মনে স্বপ্ন জেগেছিলো যে, আমাকেও একজন সর্বজন-পরিচিত সংগীতশিল্পী হতে হবে। ফলে খুব অল্প বয়স থেকেই সংগীত শিক্ষায় ব্রতী হলাম। বাবার কাছেই শিখতে লাগলাম। লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীত। কাহার তত্ত্বাবধানে আমার শিক্ষা চলতে লাগলো। কাকার কাছেও তালিম নিতাম। তারপর আমি দীর্ঘদিন বাবার বন্ধু রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কাছে তালিম নিতে শুরু করি। উনি খুব উঁচুদরের শিক্ষক এবং আমাকে প্রায় নিখুঁতভাবেই তৈরি করেছেন, আমার কন্ঠটিও তৈরি করে দিয়েছেন। বাবার কড়া নির্দেশ ছিল যে, লঘু সংগীত কিছুতেই গাওয়া চলবে না। কিন্তু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বাংলা আধুনিক গান তুলতাম এবং গাইতাম। এমনিই চলছিল। মাঝে একবার খুব অল্প বয়সেই শ্রীরামপুর সংগীত সম্মেলনে উদ্বোধনী গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর মনে আছে চুঁচুড়ায় একটি অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত কৌতুকশিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমি একদিন খ্যাতনাম্নী সংগীতশিল্পী হিসেবে জনমানসে পরিচিত হব। এইসব ঘটনায় আমি খুব অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। এই সময়ে বাবার উৎসাহে রেডিওতে অডিশন দিই এবং পাশ করি। বাবা আমাকে শ্রদ্ধেয় দেবকী বসুর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে মৃণাল সেনের 'অবশেষে' ছবিতে 'প্লে-ব্যাক' করার ব্যবস্থাও হয়ে যায়। এই সময়ে আকস্মিকভাবে বাবা মারা যান এবং আমার মনে আছে, অশৌচ অবস্থাতেই আমি কাকার সঙ্গে এসে কলকাতায় রেকর্ডিং করে যাই।

এরপর আমার বিয়ে হয় কলকাতায়। এখানে এসেই সকলের উৎসাহে গানবাজনা আবার নতুন করে শুরু করি এবং তানসেনের শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার্থে ভর্তি হই।

একদিন আমার শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় একটি ছোট্ট স্থানীয় জলসায় গান গাইছিলাম। তখন আমি পরের গানই গাইতাম। প্রখ্যাত জলসা পরিচালক অজয় বিশ্বাস আমার গান শুনে আমাকে 'সাদার্ন সমিতির' বিখ্যাত বিশাল জলসায় গান গাইবার আমন্ত্রণ জানালেন। সেই বিশাল জলসায় গান গেয়ে বেশ নাম করলাম।

এই সময়ে মৃণাল চক্রবর্তী আমাকে শ্রদ্ধেয় সুধীন দাশগুপ্তের কাছে নিয়ে গেলেন। সুধীনদা আমাকে গান শেখাতে রাজি হলেন। বললেন – কন্ঠটি নিজস্ব, কিন্তু অনেক দোষ আছে, সংশোধন করতে হবে, খাটতে হবে। আমি রাজি হলুম। আমি সুধীনদার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কারণ উনি আমাকে হাতেকলমে শিখিয়েছেন এবং আজকের বনশ্রী সেনগুপ্ত কেবল তাঁরই জন্য সম্ভব হয়েছে। এমন নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা আমি আর কারো কাছে পাইনি। অবশ্য আমি আরো অনেকের কাছেই গান শিখেছি, যেমন – প্রবীর মজুমদার, সন্তোষ সেনগুপ্ত, মীরা রায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, কমল গাঙ্গুলী, সাগিরুদ্দিন খাঁ, রামানুজ দাশগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় মুখার্জি, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বম্বে), জটিলেশ্বর মুখার্জি প্রমুখ। সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। এর মধ্যে ১৯৬৬ সালে এইচ. এম. ভি-তে অডিশন দিলাম। পাশও করলাম। এবং সে-বছরেই আমার প্রথম রেকর্ড বের হল প্রবীর মজুমদারের কথায় ও সুরে। প্রথম রেকর্ডই সাফল্য পেল এবং তারপরে আজও দীর্ঘদিন এইচ. এম. ভি-তে রেকর্ড করে চলেছি। এইভাবেই আমি পাদপ্রদীপের আলোয় আসি। এই সময়েই আমি একটি ছবিতে ('শাস্তি') পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'প্লে-ব্যাক' করার সুযোগ পাই। গানটি বেশ ভালই হয়েছিল এবং 'লিপ' দিয়েছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। পরের ছবি 'প্রতিবাদ'। পরিচালক ছিলেন তপেশ্বর প্রসাদ ও সংগীত পরিচালক ছিলেন শ্যামল মিত্র। গানটি 'তোমাদের গানের সভায়' বেশ জনপ্রিয় হল এবং আমাকে এই স্বপ্নের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।

কলকাতায় আসার পর প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আমাকে অনেকেই খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে আছেন – বিশ্বজিৎ, জহর রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, অজয় বিশ্বাস, মন্টু বসু, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হিমাংশু বিশ্বাস প্রমুখ এবং সর্বোপরি সুধীন দাশগুপ্ত।

এরপরের জীবন তো অনেকেই জানেন। এ-পর্যন্ত আমি বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, ভোজপুরী ভাষায় প্রায় দেড়শ ছবিতে নেপথ্য-কন্ঠদান করেছি। এইচ. এম. ভি থেকে আমার প্রায় ১০০টি গান বের হয়েছে। আমি রেডিও এবং টিভির প্রথম শ্রেণীর একজন শিল্পী। এছাড়া বহু নাটকেও (নেপথ্যে) কন্ঠদান করেছি। □



হৈমন্তী শুক্লা

পুতুল খেলা নয়, গান নিয়েই খেলা শুরু হয়েছিল তিন বছর বয়স থেকে। বাবা হরিহর শুক্লা সংগীত শিক্ষক – বাড়িতে সবসময় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা। সাড়ে তিন বছর বয়েসে বাবা খুব খুশি। মেয়ে সব গান তড়িঘড়ি তুলতে পারে। এইরকম অবস্থায় বাবার এক ছাত্র বাবুলাল ঘটক নিয়ে গেলেন সেনী সংগীত সমাজের এক প্রতিযোগিতায়। খেয়াল গাইলাম 'ভূপালী' রাগে সাড়ে তিন বছরেই প্রথম সাফল্য। বাবা অবাক হলেন। রেডিওতে নিয়ে গেলেন বাবার এক বন্ধু বুলুকাকা, তখন পাঁচ বছর বয়স। গার্স্টিন প্লেসে শিশুমহলে গাইতে গেলাম একসময় বাবা বললেন, একটু বোস – আমি আসছি। বাবা নেই – হঠাৎ ইন্দিরাদি এসে বললেন, চলো গান গাইবে। ছুটে গিয়ে ভজন গাইলাম। বাবা এসে অবাক – গান এর মধ্যেই হয়ে গেছে শুনে। আজ যেমন ফাংশন নিয়ে ব্যস্ত, তখন তেমনি কম্পিটিশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

১৯৬৪ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করলাম। তার আগেই ১৯৬৩-তে 'সংগীত প্রভাকর' পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রথম হলাম। আমার বাবা কিন্তু কখনও চাইতেন না, আমি লঘু সংগীত করি। বাবা চিন্ময় লাহিড়ীর ছাত্র ছিলেন। চিন্ময় জেঠু একদিন গান শুনে বাবাকে বললেন, 'তোর মেয়ে একদিন আগুনের তেজ হবে।' ওঁর কাছে প্রায়ই যেতাম। উনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছেন আমার ঠুংরি শুনে। তাঁর মতে খেয়াল শেখানো যায়, অনেক কিছুই বাঁধা থাকে। কিন্তু ঠুংরিতে নিজেকে অনেকখানি করতে হয়।

'সংগীত প্রভাকর' পরীক্ষার সময় টি. এল. রানার সঙ্গে পরিচিত হই। উনি আমার জন্য একটি শাস্ত্রীয় সংগীতের রিসার্চ স্কলারশিপ জোগাড় করেছিলেন। ইন্টারভিউ দিতে হবে দিল্লিতে। বাবার প্রচন্ড আপত্তি। আমার রাগ হল। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি চলে গেলাম। ইন্টারভিউ দিতে। বিচারক ছিলেন কে. জি. চেকনে, বিনায়ক রাও পটবর্ধন, নিখিল ঘোষ প্রমুখ। স্কলারশিপ পেলাম।

এতদিন শিশুমহলেই গাইতাম। ১৯৬৪ সালে জেনারেল বিভাগে অডিশন দিলাম। গলা খুব খারাপ ছিল। আবার বাবুকাকাই উৎসাহ দিলেন, 'দিয়ে দে, ফেল করলে আবার দিবি।' অডিশন দিলাম, এবং বি-হাই গ্রেডেশন পেলাম। আধুনিক গান কিন্তু তখনও করিনি। বাড়িতে রেকর্ডের আধুনিক গান তুললাম। এইসময় নৃপেনদা আমাকে নিয়ে গেলেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। নৃপেনদা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতেন – আমাকে নিয়ে তাঁর প্রচন্ড উৎসাহ। একইরকম উৎসাহ পিন্টুদার (পিন্টু ভট্টাচার্য)। আমাকে গান গাইতে দেখলেই তাঁদের আনন্দ। অনেক সময় তাঁরা ফেরবার পথে দশ-কুড়ি টাকা দিতেন, আমি অপ্রস্তুত হতাম। অদ্ভুত এক মানসিকতা। নৃপেনদাই একদিন নিয়ে গেলেন সুরশ্রী অর্কেস্ট্রায়। সেখানে বসে আছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও অনেকে। তবলায় রাধাকান্ত নন্দী। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় 'মায়ার সংসার' ছবির গানের রিহার্সাল হচ্ছে। 'আমার প্রভাত মধুর হল' গানে একটি অল্পবয়েসী মেয়ের গলা দরকার। রাধাকান্ত নন্দী বললেন, 'আরে, এ তো হরিহরদার মেয়ে।' রবীন চট্টোপাধ্যায় আমার গান শুনে খুব খুশি। ওইসময় অপরেশ লাহিড়ীর একটি ছবিতেও গানের কথা হয়েছিল। নৃপেনদা অনেক সময় হঠাৎ ভোর চারটের সময় তুলে নিয়ে গেছেন, বাইরে গান গাওয়ার জন্য। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি দ্বিজেনদা, মানবদা, নির্মলাদি, নির্মলদা সব দাঁড়িয়ে আছেন – এক স্বপ্নের জগতে যেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি!

প্রথম দিন শৈলেন মুখোপাধ্যায় যখন গান শুনতে চাইলেন তখন গাইলাম ভজন। শৈলেনদা বললেন, 'ভজন তুমি তো ভাল গাইবেই। আধুনিক গান জান?' আমি বললাম, 'রেকর্ড থেকে তুলেছি।' শৈলেনদা বললেন, 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে' জান? আমি তাই গাইলাম। শৈলেনদা খুব খুশি। চলল আমার আধুনিক গানের পরিচয় পর্ব। হঠাৎ একদিন হিন্দুস্থান রেকর্ডের নীরোদদার কাছ থেকে ফোন – ওঁদের 'সাত ভাই চম্পা' নামে একটি শিশু গীতিনাট্য রেকর্ড হবে – তার মধ্যে সামান্য একটি চরিত্র আমায় গাইতে হবে। স্টুডিওতে গিয়ে দেখি সংগীত পরিচালক শৈলেন মুখোপাধ্যায়। আমি ভরসা পেলাম। হঠাৎই প্রধান গায়িকা জপমালা ঘোষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক। পরের দিন শৈলেনদা জানালেন, 'জপমালা ঘোষ গাইবেন না, প্রধান ভূমিকায় আমাকেই গাইতে হবে।' নীরোদদা খুব নার্ভাস, 'তুমি পারবে তো?' শেষ পর্যন্ত ভালভাবেই গাইলাম। রেকর্ডটা খুব ভাল হল। তখন হিন্দুস্থানে পুজোয় আধুনিক হত না। শৈলেনদা জেদ ধরলেন আমায় দিয়ে গাওয়ানোর জন্য। এমনকি তিনি কোম্পানিকে বললেন, 'আমার তো রয়্যালটি বাবদ অনেক টাকা আপনাদের কাছে পাওনা আছে, ওর গানের জন্য সেটা আমি বাজি ধরতেও রাজি আছি।' আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'মিউজিক হ্যান্ডসের জন্য কয়েকশো টাকা খরচা।' শৈলেনদা ধমক দিলেন, 'তুমি গানটা সম্পর্কে ভাবো – অন্য কিছু নয়।' রেকর্ডিংয়ের দিন গিয়ে দেখি পিন্টুদাও উপস্থিত। একটি গানে কোরাস হামিং ছিল। সেই হামিংটুকুতে গলা দিলেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য। শৈলেনদার সুরে আমার প্রথম রেকর্ড, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় 'এ তো কান্না নয়' এবং মিল্টু ঘোষের কথায় 'ময়ূর নাচ কে দেখবি আয়'। শৈলেন দাকেই একসময় বললাম, 'আমার খুব টাকার দরকার।' শৈলেনদা বাণীচক্রে ক্লাশের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই বাণীচক্রে আমার শুধু গান শেখানো নয় – ক্লাশের শেষে নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত এঁদের ক্লাশে বসা, শোনা আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিল।

একদিন শ্রীরামপুর কলেজে গান গাইতে গেলাম। সেখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ। আমি তখন হিন্দি গান গাইতাম, লতা মঙ্গেশকরের। রেকর্ড-করা গানও গাইতাম, এর মধ্যে হেমন্তদার সুর-করা গানও ছিল। হেমন্তদা খুব খুশি। তিনি বললেন, 'আমি নাগাল্যান্ডে যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?' হেমন্তদার

বাড়ি গিয়ে অনেক ডুয়েট গান রিহার্সাল দিলাম – রবীন্দ্র সংগীতও। হেমন্তদা সবসময় নতুনদের উৎসাহ দেন – আমিও তা থেকে বঞ্চিত হইনি।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা একটু পরে জন্মেছি। দিকপাল সংগীত পরিচালক অনেককেই পাইনি। তবু যা পেয়েছি, তাতেই আমি ধন্য। সলিলদার সুরে গান গাইলাম। সলিলদা আমাকে রাগভিত্তিক গান দিলেন। কিন্তু সে গান আমার এতদিনের শিক্ষাকেও চমকে দিল। এভাবেই, রাগসংগীতকে ভাঙা কি যায়? অতবড়প্রতিভা, মনে হয় সমুদ্রের পারে বসে আছি। আমি ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ গানটাই আগে গেয়েছিলাম, অনেকে তা গান না। নচিকেতা ঘোষের ছন্দ বা সুধীন দাশগুপ্তের মেলোডিও আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছে। অনেকে বলেন, কেন আমি মান্না দে-র সুরে বেশি গান করি? মান্নাদার কাছে আমি অনেক শিখেছি, পুরো গানটি তিনি আমাকে দিয়ে আদায় করে নিয়ে ছাড়েন। এই শেখা বা গাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। অনেকসময় এঁদের সামনে মনে হয় কিছুই শেখা হয়নি। অহঙ্কার করার কিছুই নেই। এখন ফাংশনে গাইবার জন্য হাজার হাজার টাকা চাই। অথচ আমি তো জানি, আমার বাবা একসময় কত কষ্ট করেছেন। তাঁর ভান্ডার থেকে হয়ত এক আঁজলা আমি পেয়েছি, ফলে টাকাপয়সা, মানসম্মান যতই পাই, সবসময় মনে হয়, আমার তুলনায় অনেক নিপুণ শিল্পী আছেন, অথচ যথাসময়ে কদর না পেয়ে শুধুই সংগ্রাম করে গেলেন। □



অরুন্ধতী হোম চৌধুরী

সে এক অদ্ভুত দেশ। হয়ত বাস্তব চেহারার সঙ্গে রূপকথা মেলে না। চোখ মেললে অবাধ প্রকৃতি, কান পাতলে রূপকথার গান। দেশটির নাম আগরতলা। হ্যাঁ, আগরতলাতেই কেটেছে আমার জীবনের অনেক বছর। পরিবেশ অনেকখানিই কাজ করে। ছোটবেলা থেকে যেমন হয় – রেকর্ড, রেডিও থেকে গান তোলা। সেইভাবেই গান গাইছি। প্রথম থেকে ঝোঁক এল লোকসংগীতের দিকে। এই যে প্রবণতা, সেটা বোধহয় জলহাওয়ার গুণ। অমিয় দাসের সহযোগিতায় চর্চাও চলল পুরোদমে। এরই সঙ্গে ত্রিপুরার মিউজিক কলেজে মার্গসংগীত শিক্ষা। আগরতলায় কোন কিছুরই অসুবিধে নেই। অন্তত প্রাণভরে গান গাওয়ার। অদ্ভুত একটা যোগাযোগ। শান্তিনিকেতনের সেবিকা পাল ওখানে গান শেখাতেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যেমন গান করতাম – তেমনি যে-কোনো রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রসংগীতের আসরেও গাইতাম। অথচ ঝোঁকটা অন্যদিকে। কিন্তু প্রথম যে শিখেছিলাম, তারই ফল পরে পাওয়া গেল। অনেকদিন পরে ফিল্মে প্রথম যে গান গাওয়ার সুযোগ এল সেই গানটি রবীন্দ্রসংগীত। 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ছবিতে 'এমনি করে যায় যদি দিন যাক না'। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল – কিছুতেই রাজি হই না – রবীন্দ্রসংগীত বলেই ভয়, যদি না পারি? যদিও কলকাতায় আমি তখনও মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করে থাকি। তবু ভরসা হয় না – সত্যিই তো সেভাবে শিখিনি। ভরসা যোগালেন সরোজদা (সরোজ দে) এবং শঙ্করদা (শঙ্কর ঘোষ)। গাইলাম, এবং ওই গানের জন্যে সেই বছরেই বি. এফ. জে. এ. অ্যাওয়ার্ড। এরপরের ঘটনা আরও মারাত্মক। অজয় কর ছবি করছেন শরৎচন্দ্রের 'দত্তা', সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সেখানে গায়িকা সুচিত্রা সেনের মুখে একটি গান 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' – একটা সংশয় দেখা দিল। সুচিত্রা সেন নিজের চিত্রায়িত গান সম্পর্কে খুব খুঁতখুঁতে। ফলে সবাই একটু দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু প্রযোজকের জেদ। হেমন্তদাও বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন, তাহলে মেয়েটিকে ডাকুন।' ভয়ানক একটা ভয় নিয়ে গেলাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যাঁর নাম ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি – তাঁর সামনে গান গাওয়া! হেমন্তদা গাইতে বললেন। ওই গানটা জানা ছিল, গেয়ে দিলাম। হেমন্তদা বললেন, 'ঠিকই তো আছে।'

কলকাতায় আসার পর অনেকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। এর মধ্যে দীনেন চৌধুরীর গ্রামীণ গীতি সংস্থায় গান গাইতে আরম্ভ করলাম। উনি আমাকে প্রচুর সহায়তা করেছেন। পুরনো গানের পাশাপাশি আধুনিক গানের যে একটা নতুন ধারা চলছে – সেটা দীনেন চৌধুরী, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অশোক রায়ের কাছ থেকে চিনলাম। এইভাবে কলকাতায় থাকার সুযোগ যদি না পেতাম, তবে হয়ত জীবনটা অন্যরকম হত। যখন বি. এ পরীক্ষা দিই তখন ডাক এল 'বেহুলা লখীন্দর' ছবিতে পাঁচখানি গান গাইবার। সুরকার সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। কি অসাধারণ রাগ মিশ্রণ – অথচ সন্তোষ মুখোপাধ্যায় এমনভাবে শেখালেন যে, আমার কোনো অসুবিধেই হল না। তখন পরীক্ষা চলছে। দুটো পরীক্ষার মাঝখানে যে বিরতির দিন সেই সময় এক এক করে গান রেকর্ড হতে থাকল। রেকর্ডিংয়ের সময় দীনেশদার (দীনেশ দে) কি উৎসাহ! সরোজ দে প্রথম থেকেই আমায় স্নেহ করতেন। যখন 'স্বাতী' ছবি হল তখন আবার গানের জন্য ডাক পেলাম। সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'স্বাতী' ছবিতে দুটি গান। একটি একক, আর একটি ডুয়েট মান্না দে-র সঙ্গে। মান্নাদা বললেন, 'তুমি নতুন এসেছ, গান গাইছ, কিন্তু গান শোন তো? শুনবে, ভাল করে শুনবে। শোনাটা অনেকখানি, বিশেষ করে লতা মঙ্গেশকরের গান। কিভাবে তিনি উচ্চারণ করেন, কিভাবে গানকে গড়ে তোলেন সব লক্ষ্য করবে।'

ফিল্মে গান পরপর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রেকর্ড আর হয় না। বিমানদাকে (বিমান ঘোষ) বলতে, একসময় তিনি লালনের গান সংকলনে গাইতে দিলেন। তারপর ১৯৭৬ সালে প্রথম পুজোর রেকর্ড সুধীন দাশগুপ্তের সুরে। ক্রমশ অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অজয় দাস, দীনেন চৌধুরী অনেকের সুরেই গেয়েছি।

বহুদিন ধরে স্বপ্ন ছিল সলিল চৌধুরীর সুরে গাইবার। বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি এর ব্যবস্থা করলেন। সলিলদা গান শুনতে চাইলে শোনালাম তাঁরই গান। তারপর কলকাতায় ইনডোর স্টেডিয়ামে লতাজীর কয়েকটি গান গাইলাম। সলিলদা নিজেই ঘোষণা করলেন, পুজোয় উনি আমাকে দিয়ে গাওয়াবেন। জীবনের পরম লগ্ন। কি ভীষণ অনুভূতি, সুরের এক একটা বদল ঘটান, যা শিহরিত করে দেয়। হঠাৎ গান তোলার পর একদিন বললেনঃ আচ্ছা তোমার তো 'এফ' শার্পে গলা যাবে – যদি গানটা এরকম ভাবে করি – সে কি শুধুই

বদল – মনে হল অনেক জানলা খুলে গেল। তিনটি গান করার পর বললেন 'আর পারছি না, তুমি 'কে যাবি আর' গানটি কর। আমার ভীষণ আপত্তি, ওটা লতা মঙ্গেশকরের, রেকর্ড আছে – আমি কিভাবে সেই স্মৃতিকে মুছতে পারি? যে-কারণে পুরনো গানও আমি করতে চাই না। কিন্তু সলিলদা বারবার অভয় দিতে লাগলেন – অগত্যা ভীষণ দ্বিধা নিয়ে রেকর্ড করলাম। কিছুদিন আগে রানার প্রয়োজনায় একটি ছবিতে সলিলদা আমাকে দিয়ে একটি পপ্ গান রেকর্ড করালেন। আমার দ্বিধা – পপ্ কিভাবে গাইব? সলিলদা বললেন, তুমি যা ভাবছ তা নয়, পপ্ জিনিসটা অন্য চেহারা নেবে। পপ্ গান যে ওরকম হতে পারে, আমার ধারণার বাইরে। আবার কতকগুলি জানলা খুলে গেল। আমি আরও জানলা খুলে যাবার অপেক্ষায় আছি। □



শ্রাবন্তী মজুমদার

'কী করে শিল্পী হলাম' লিখতে বসে প্রথমেই হোঁচট খেলাম 'শিল্পী' শব্দটিতে। নিজেকে শিল্পী ভাবার মতন Conceit আমার নেই। তবে একটা জায়গায় আমি পৌঁছেছি ঠিকই – আজ সে কথাই আমি লিখব।

মনে পড়ে গেল আমার পাঁচ বছর বয়সের সেই দিনগুলো, যখন সংগীতে আমার প্রথম হাতেখড়ি। শিখতে শুরু করি খেয়াল, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কেমন করে জানি না আমার মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই বাবার মনে হয়েছিল আমি কেশরবাঈয়ের মত একজন সার্থক শিল্পী হব। বাবার প্রেরণা আর আমার সংগীতের প্রতি আগ্রহ – এই দুইয়ের ফল আজ আমি যেখানে পৌঁছেছি।

আমার গলার স্বর খুব ভারী ছিল। ফলে গলা ছেড়ে রেয়াজ করতে বেশ লজ্জাবোধ করতাম ছোটবেলায়। কিন্তু বাধ্যতামূলক ভাবেই রোজ রেয়াজ করতে হত। ছোট থেকেই সব ধরনের গানই আমার ভাল লাগত – শুনতে এবং গাইতে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সংগীত আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত। Elvis Presley আমার স্বপ্ন ছিল। ছেলেবেলা থেকেই কল্পনার জগতে রঙিন জাল বিস্তার করে এক মনোরম সংগীত জগতের স্বপ্ন দেখতাম। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিন উপলব্ধি করলাম – পড়াশোনা শেষ করে একজন সংগীতশিল্পী হওয়াই আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন।

ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ভাষায় গান গাইতে আমার খুব ভাল লাগত। গানের কথা ভুল হলেও সুর কখনো ভুল হত না। কারণ আমার কান বরাবরাই খুব তীক্ষ্ণ এবং আমি Perfectionist by nature.

এখন ভাবলে হাসি পায় – একবার ঝঙ্কার মিউজিক সার্কেলে পরীক্ষা দিয়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম । এরপর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ঝঙ্কারের অনুষ্ঠানে আমি রাগ কামোদ গেয়েছিলাম। তখন আমি সিক্স-সেভেনে পড়ি। এতই ভয় পেয়েছিলাম যে, শুধু সা বলতে আমার প্রায় তিন মিনিট লেগেছিল। বলতে গেলে এটাই আমার জীবনের প্রথম অনুষ্ঠান।

মা-বাবার দৌলতে ছোটবেলা থেকেই বহু Classical conference-এ যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, যদিও আমার পরিবারের কেউ কোনদিন সংগীত জগতে আসেননি। গান সবাই খুবই ভালবাসতেন – বলাই বাহুল্য আধুনিক গান নয়।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের গান আমি শিখেছি অনেকের কাছে। লোকসংগীত – দীনেন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রসংগীত – মায়া সেন, আধুনিক গান – সুধীন দাশগুপ্ত, ভি বালসারা এবং মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ওস্তাদ মুনাওয়ার আলি খাঁর কাছে এখনো মাঝে মাঝে তালিম নিতে যাই । কিছুদিন ওস্তাদ আমিনউদ্দিন ডাগরের কাছেও গিয়েছি।

১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে গাইতে এলাম বিজ্ঞাপনের গান। দীপঙ্কর চ্যাটার্জি আমাকে কর্ণেল আর. এন. বোস নামে এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে আসেন। আমার কন্ঠস্বরে উনি কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কোলে বিস্কুটের গান গেয়েছিলাম বিজ্ঞাপনে প্রথম।

১৯৬৯ সালে লিভিং সাউন্ড নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানির ব্যানারে চারটি গান রেকর্ড করি । এইচ. এম. ভি-র এ. সি. সেনের ভাল লাগে আমার গান এবং আমাকে এইচ. এম. ভি-তে রেকর্ড করার জন্য বলেন। Classical এবং Western দুরকম সংগীতের প্রভাব আমার উপর থাকা সত্ত্বেও প্রথম থেকেই আমার একটি নিজস্ব Style ছিল, যা অন্য কারো মতো নয়। কেশরবাঈ হবার স্বপ্ন দিয়ে গানের জীবন শুরু করে যখন Pop singer হলাম, সেদিন বাবা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। আধুনিক গান গাইতে এলাম কেন? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আর কোনো রাস্তা খুঁজে পাইনি বলে। পপ্ গান নিয়ে অনেক ঠাট্টা এবং বিদ্রূপ শুনেছি। এই টাইটেলটার মধ্যে কেমন যেন একটা অচ্ছুৎ ভাব ছিল। এখন অবশ্য পপ্ গান গাওয়াটা একটা কৃতিত্ব। আসলে আমি বোধহয় সময়ের থেকে দশ বছর এগিয়ে ছিলাম বলেই এই ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে আমার ধারণা পপ্ কথাটা আমার বেলায় এখন একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবাই বোঝাতে চায় – প্রাণবন্ত গাইয়ে। আমি সব ধরনের গান গাইতে ভালবাসি, গেয়ে থাকি এবং আমার শ্রোতারা তা অত্যন্ত ভালোভাবে গ্রহণ করে থাকেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে গলার আওয়াজ নিয়ে ছোটবেলা থেকে আমার এত complex ছিল – আজ সেই আওয়াজই পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত। ভাবতে ভাল লাগে, বাবা যে বৈশিষ্ট্য আমার মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই খুঁজে পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা সবার কাছেই স্বীকৃতি পেয়েছে। এর থেকে বেশি পাওয়া একজনের জীবনে আর কী হতে পারে!

আধুনিক গানের জগতে আমার প্রেরণা ছিলেন – হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলে। আমার স্বপ্ন, কোনদিন যেন এঁদের মতো হতে পারি।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বিজ্ঞাপনের কাজ করে কখন আমি গান করার সময় পাই এবং আমার এই বিজ্ঞাপনের কাজ কি আমার এই সংগীত জীবনের প্রসারের পথে অন্তরায় নয়? আমার উত্তর – যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। আজ আমার জীবনে এই বিজ্ঞাপন ও গানের জগত এক হয়ে মিশে গেছে। এই বিজ্ঞাপনই আজ আমাকে পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে তাদেরই একজন করে। শুধু গায়িকা শ্রাবন্তী কি তা পারত? □

সংক্ষিপ্ত পাক্ষিক রাশি ও লগ্নফল

১৬ – ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

মেষ ঃ নিজের ভুলে পারিবারিক অশান্তি ও আর্থিক টানাটানির মধ্যে পড়তে হবে। শরীর বিশেষ সুবিধার নয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা চলবে। শুভ তারিখ – ১৮, ২২ ও ২৬। মেষ লগ্নের জাতিকার শত্রুতা বৃদ্ধি হলেও তাদের বশে রাখতে পারবেন।

বৃষ ঃ কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য চলতে পারে। রক্তচাপবৃদ্ধি, বদহজম, অর্শ অথবা পেটের গোলমালে কষ্ট। কোন ধর্মীয় বা আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। আর্থিক শুভাশুভ মিশ্র ফল। শুভ তারিখ – ১৭, ২৩, ২৪ ও ২৮। বৃষ লগ্নের জাতিকারা এ পক্ষে সর্বক্ষেত্রে শুভাশুভ মিশ্র ফল আশা করতে পারেন। তবে হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া থেকে সাবধান।

মিথুন ঃ নিজের গুণে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে পারবেন। বড় যোগাযোগ আসতে পারে। শুভ তারিখ – ২১, ২৫, ২৬ ও ২৭। মিথুন লগ্নের জাতিকারা শত্রুদের বশে আনতে পারবেন। কাউকে ভুল বোঝা বিষয়ে সাবধান।

কর্কট ঃ পারিবারিক, শারীরিক ও আর্থিক সকল ক্ষেত্রে এই পক্ষ বিশেষ শুভ। কর্ম বা ব্যবসা ক্ষেত্রে নতন যোগাযোগ আয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। কোন সত্যিকারের উপকৃত ব্যক্তিকে ভুল বোঝা বিষয়ে সাবধান। শুভ তারিখ – ২১, ২৪, ২৬ ও ২৭। কর্কট লগ্নের জাতিকারা বাত অথবা গ্যাসের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। স্বামীর শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ ঃ পূর্বের তুলনায় এ পক্ষ অনেকাংশে শুভ। দাঁত ও গ্যাসের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। সচেষ্ট হলে সম্পত্তি সংক্রান্ত গোলযোগ মিটে যাবে মাঙ্গলিক কাজে মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। শুভ তারিখ – ১৬, ১৯, ২২ ও ২৭। সিংহ লগ্নের জাতিকারা শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও নিজের গুণে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কন্যা ঃ আত্মীয় পরিজন সহ এ পক্ষ সুখেই কাটবে। কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। শারীরিক দুর্বলতা থাকলেও আর্থিক চিন্তা অনেকাংশে দূর হবে। মনোমালিন্য এড়িয়ে চলা উচিত। শুভ তারিখ – ১৮, ২০, ২২ ও ২৮। কন্যা লগ্নের জাতিকার নতুন বন্ধুলাভ। নিকট আত্মীয়ের শরীর চিন্তার কারণ হবে। ধর্মীয় ভাব বৃদ্ধি পাবে।

তুলা ঃ এই পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই মিশ্রফল আশা করা যায়। বুদ্ধির ভুলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি এবং শত্রুতা বৃদ্ধির যোগ আছে। একমাত্র উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হলে কিছু শুভ যোগ এবং আর্থিক চিন্তা কিছুটা দূর হবে। শুভ তারিখ – ১৭, ২৩, ২৪ ও ২৭। তুলা লগ্নের জাতিকারা মানসিক অশান্তিতে ভুগবেন। স্বামী বা সন্তানের কাছ থেকে মানসিক আঘাত পেতে পারেন।

বৃশ্চিক ঃ অহেতুক অশান্তিতে মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি। পুরনো রোগে কষ্ট পেতে পারেন। স্বার্থান্বেষী আত্মীয় বা বন্ধু থেকে সাবধান। অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হলে অত্যধিক ভোগাকাঙ্ক্ষায় অর্থব্যয় হতে পারে। শুভ তারিখ – ১৮, ১৯, ২৫ ও ২৭। বৃশ্চিক লগ্নের জাতিকারা স্নায়বিক পীড়া হলে প্রথম অবস্থায় সাবধান হবেন। স্বামীর সঙ্গে অযথা বিরোধ হতে পারে।

ধনু ঃ পারিবারিক শান্তি। পরিশ্রমের মর্যাদা পাবেন। আয় ভাল হলেও ব্যয়ের চাপ থাকবে। কর্ম ও ব্যবসা ক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় থাকবে। মূলা ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হলে ভোগ-সুখ বৃদ্ধি পাবে। শুভ তারিখ – ১৭, ২০, ২৪ ও ২৮। ধনু লগ্নের জাতিকারা অন্যের সাহায্য লাভ ও কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হবেন।

মকর ঃ প্রিয়জনদের নিয়ে পক্ষটা মোটামুটি সুখেই কাটবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতা চললেও নিজগুণে তা কাটিয়ে উঠে আধিপত্য ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবেন। বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির সাহায্য লাভ, কর্ম ও ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতি ও দায়িত্ব বৃদ্ধির যোগ আছে। শুভ তারিখ – ১৮, ২১ ও ২৮। মকর লগ্নের জাতিকারা মানসিক ও শারীরিক আঘাত পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ ঃ একরোখা ভাব ত্যাগ করলে কর্মে এবং ব্যবসায়ে সফলতা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। পেট, চোখ বা মাথার রোগে কষ্ট পাবেন।
শুভ তারিখ – ১৯, ২১ ও ২৫। মকর লগ্নের জাতিকার পেটের রোগ ও দুর্বলতার লক্ষণ আছে। উদ্যোগী হলে স্বামী ও সন্তান উন্নতি করতে পারবেন।

মীন ঃ পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মীয়-বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য লাভ হবে। মানসিক বিক্ষিপ্ত অবস্থার সৃষ্টি। ফলে মানসিক ও শারীরিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। শুভ তারিখ – ১৬, ১৭, ২৩ ও ২৮। মীন লগ্নের জাতিকারা বাক্‌সংযম না করলে অপমানিত হতে পারেন। আপনার বুদ্ধিনৈপুণ্য আপনাকে সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করবে।

শ্রীগৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতী

এ পক্ষের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

১৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে দৃশ্যকাব্য গোষ্ঠীর নাটক, অ্যাকাডেমিতে পি এল টি-র নাটক, শিশির মঞ্চে প্রত্যয়-এর নাটক লক্ষ্মণের শক্তিশেল, মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক প্রযোজিত নাটক।

১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে সকালে পারিজাত শিল্পী গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় রবিতীর্থের সংগীতানুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে সকালে চেনামুখ-এর নাটক, শিশির মঞ্চে প্রত্যয়-এর নাটক আবার হব রাজা, মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক-এর নাটক, বিজনে থিয়েটার ইউনিটের নাটক বিল-কিস বিগম।

১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে সীমান্তিক সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে পঞ্চম বৈদিক-এর নাথবতী অনাথবৎ, শিশির মঞ্চে প্রত্যয়-এর নাটক নাচের পুতুল।

১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অ্যাকাডেমিতে চেতনার নাটক, মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার টুডে গোষ্ঠীর নাটক ফেরা, বিজন থিয়েটারে শিল্পসূর্য সংস্থার নাটক।

২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে গ্রীন অ্যামেচার গ্রুপ-এর নাটক, অ্যাকাডেমিতে ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার-এর নাটক, শিশির মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মুক্তাঙ্গনে ব্যতিক্রম গোষ্ঠীর নাটক তিন এক্কে তিন, বিজন থিয়েটারে রূপম নর্থ-এর অনুষ্ঠান।

২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অ্যাকাডেমিতে নান্দীকার-এর নাটক, শিশির মঞ্চে সৃষ্টির নাটক, মুক্তাঙ্গনে ভার্গব গোষ্ঠীর নাটক বোমা।

২২ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রসদন স্টাফ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠান, মুক্তাঙ্গনে ইন্ডিয়ান কাল-চারাল ফোরাম-এর নাটক কম-লার আত্মদর্শন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে গিরিজাশংকর স্মৃতিপরিষদ-এর অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটক, মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক-এর নাটক রামনাম কেবলম।

২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে সকালে সুরদীপা সংস্থার অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় চিত্রা সংগীত মজলিশ-এর অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে বহুরূপীর নাটক, শিশির মঞ্চে সুরছন্দম সংস্থার অনুষ্ঠান, মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক-এর নাটক, বিজনে থিয়েটার ইউনিটের নাটক বিল-কিস বেগম।

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার কমিউনের নাটক, শিশির মঞ্চে নন্দক-এর অনুষ্ঠান, মুক্তাঙ্গনে সংলাপ কলকাতা গোষ্ঠীর নাটক।

২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন, অ্যাকাডেমিতে চেতনার নাটক, শিশির মঞ্চে নর্থ ক্যালকাটা থিয়েটার অ্যাকাডেমি-র নাটক, মুক্তাঙ্গনে পদক্ষেপ গোষ্ঠীর নাটক ঝিনুকের মুক্তো, বিজন থিয়েটারে সাঙ্গিক সংস্থার অনুষ্ঠান।

২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রবীন্দ্রসদনে সমীক্ষণ-এর নাটক কানামাছি খেলা, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ফ্রন্টের নাটক, শিশির মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মুক্তাঙ্গনে সন্দীপন-এর নাটক সমকোণ।

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অ্যাকাডেমিতে নান্দীকার-এর নাটক, শিশির মঞ্চে মৃণ্ময়ী সংস্থার নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা, মুক্তাঙ্গনে সপ্তদীপ গোষ্ঠীর নাটক।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ঃ ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, রেজিঃ অফিস, ৩৩ বিপ্লবী অনুকুলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ২৭-২১৬৯, ২৭-৩০১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-5092 IPPL IN


"মা, আমার খিদে পাচ্ছে..."
বাচ্চাদের সব সময়ই খিদে পায়—আর আশ্চর্য, তার কোনো সময় অসময় নেই। এবং কোনো মা-ই কি এই ছোট্ট সহজ কথাগুলোকে ফেলতে পারে? কিন্তু আপনিও তৈরী। কারণ সুস্বাদু পুষ্টিকর চমৎকার খাবার তৈরী করার জন্য আপনার হাতে আছে ম্যাগি। পাঁচটি চমৎকার ফ্লেবার–চিকেন, মসালা, ক্যাপসিকা, লাসানিয়া এবং সুইট সাওয়ার দিয়ে খাবার তৈরী করে দিন।
অবশ্য বাচ্চারা তো রকমারী খাবারেরই ভক্ত। আর ওদের জন্য নতুন নতুন খাসা রান্না করতে আপনারও ভাল লাগবে।
বিনামূল্যে!
ম্যাগি
ব্যাঞ্জন পুস্তিকা
আপনার জন্য একটি পুস্তিকা পাঠাতে লিখুন এই ঠিকানায়:
পোস্ট বক্স নং ৩৮৫৫
নিউ দিল্লী
চীজ 'এন' ক্যাপসিকাম
উপকরণ
১ প্যাকেট ক্যাপসিকা টেষ্টমেকার সহ ম্যাগি ২ মিনিট নুডল্স্
১টা সিমলা মরিচ, কুচিয়ে
১টা পেঁয়াজ কুচিয়ে
বড় চামচের ১ চামচ তেল
১½ কাপ (২০০ মিলিলিটার) জল
১ কিউব (৩০ গ্রাম) চীজ, কোরানো
পদ্ধতি
কুচোনো পেঁয়াজ ও সিমলা মরিচ তেলে অল্প একটু ভেজে নিন। ঐ বাসনেই জল ফুটতে দিন। জল ফুটে গেলে টেষ্টমেকার এবং ম্যাগি ২-মিনিট নুডল্স দিয়ে দিন। ২ মিনিট ফুটতে দিন। কোরানো চীজ ছড়িয়ে দিন এবং পাতলা ও গোল গোল করে কাটা সিমলা মরিচ সহযোগে পরিবেশন করুন।
MAGGI®
2-Minute noodles
NEW
MAGGI®
2-Minute noodles
with Capsika Tastemaker inside
Fast to cook! Good to eat!
রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাদারী!
FSL-8540 BEN